HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ০১ সরকার

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সরকার
টপিক ০২: গণতন্ত্র
টপিক ০৩: প্রজাতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র
টপিক ০৪: সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
টপিক ০৫: এককেন্দ্রিক সরকার
টপিক ০৬: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
টপিক ০৭: রাজতান্ত্রিক সরকার
টপিক ০৮: সমাজতান্ত্রিক সরকার
টপিক ০৯: সামরিক সরকার
টপিক ১০: ধর্মতান্ত্রিক সরকার
টপিক ১১: উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: সরকারের বিভাগ বা অঙ্গসমূহঃ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ
টপিক ১৩: আইন বিভাগ
টপিক ১৪: শাসন বিভাগ
টপিক ১৫: বিচার বিভাগ
টপিক ১৬: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা
টপিক ১৭: সরকারের অঙ্গসমূহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা
টপিক ১৮: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৯: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সরকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সরকার

একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যে যতগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে বড় প্রতিষ্ঠান হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র হলো পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এই চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই চারটির মধ্যে সরকার হলো রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের সরকার পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। সরকার একটি বাস্তব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের মুখপাত্র। সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলতে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সমন্বিত রূপকে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সরকার বলতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমষ্টিকে বোঝায়। কেননা সরকার গঠিত হয় সকল নাগরিকের সম্মতিক্রমে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার পরিবর্তন করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মূলত সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ ও সংগঠন আলাদা হয়ে থাকে।

সরকার

রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকার। রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিধি-নিষেধসমূহ সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি এজন্যই বলেছেন যে, 'সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র' (A Government is a spokesman to the state)। সরকার একটি বাস্তব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলতে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সরকার গঠিত হয় সকল নাগরিকের সম্মতিক্রমে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার গঠন ও পরিবর্তন করে থাকে। রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ, কাঠামো ও সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে।

সরকার

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

গ্রিক দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল তাঁর 'The Politics' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে দুটি নীতি বা ভিত্তি বা মাপকাঠির সাহায্যে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, যথা- (ক) সংখ্যানীতি ও (খ) লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যনীতি। সংখ্যানীতি অনুযায়ী তিনি সরকারকে একজনের, কয়েকজনের এবং অনেকের শাসন-এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। উদ্দেশ্য নীতি অনুযায়ী তিনি সরকারকে আবার স্বাভাবিক ও বিকৃত- এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং পলিটি হলো স্বাভাবিক সরকার। অপরদিকে স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র বা কুলীনতন্ত্র এবং গণতন্ত্র বা জনতাতন্ত্র হলো বিকৃত সরকার। পলিটিকে তিনি উত্তম সরকার এবং জনতাতন্ত্রকে (গণতন্ত্রের বিকৃত রূপ) নিকৃষ্ট ও বিকৃত সরকার বলে অভিহিত করেছেন।

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

নিম্নে ছকের সাহায্যে এরিস্টটলের এ শ্রেণিবিভাগ দেখানো যেতে পারে :

পরবর্তীতে জ্যাঁ জ্যাক রুশো, মন্টেস্কু, ম্যারিয়ট, লীকক, ম্যাকাইভার, এ্যালান আর বল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানিগণ সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। অধ্যাপক লীকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণিবিভাগটি সহজ সরল প্রকৃতির। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান ও ব্যবহারের ভিত্তিতে সরকারকে গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে তা' থাকে একব্যক্তি বা একনেতা বা এক দলের হাতে। বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র হলো সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা।

সরকার

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা লাভের পদ্ধতি অনুসারে সরকারকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) এবং প্রজাতন্ত্র (Republic) এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন উত্তরাধিকারসূত্রে। রাজা বা রানি নামমাত্র শাসক। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের হাতে। গ্রেটব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রে এরূপ সরকার প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন রাষ্ট্রপ্রধান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা নির্বাচিত হন তখন তাকে 'প্রজাতন্ত্র' বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে।

আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকার দু'রকমের হতে পারে, যেমন- সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত (Parliamentary or Cabinet Government) এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (Presidential Government)। সংসদীয় সরকারে শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠিত হয় আইন বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা। মন্ত্রিসভা অর্থাৎ শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে। এরূপ শাসন প্রচলিত রয়েছে গ্রেট ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্য, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের দ্বারা গঠিত হয় না এবং সাধারণত আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়াসহ অনেক রাষ্ট্রে এরূপ সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

সরকার

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন নীতি অনুসারে সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal Government) এবং এককেন্দ্রিক (Unitary Government) সরকার এই দু'রকম হতে পারে। এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে গ্রেট ব্রিটেন, বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে। এককেন্দ্রিক সরকারে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সকল ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়।

গণতন্ত্র আধুনিক যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার। গণতন্ত্রে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ। কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সামনে রেখে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের মাধ্যমে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও এ সরকারের লক্ষ্য হলো সামাজিক কল্যাণ এবং সম্পদের সুষম বণ্টন।

সরকার

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

ছকের সাহায্যে নীককের শ্রেণিবিভাগ দেখানো যেতে পারে :

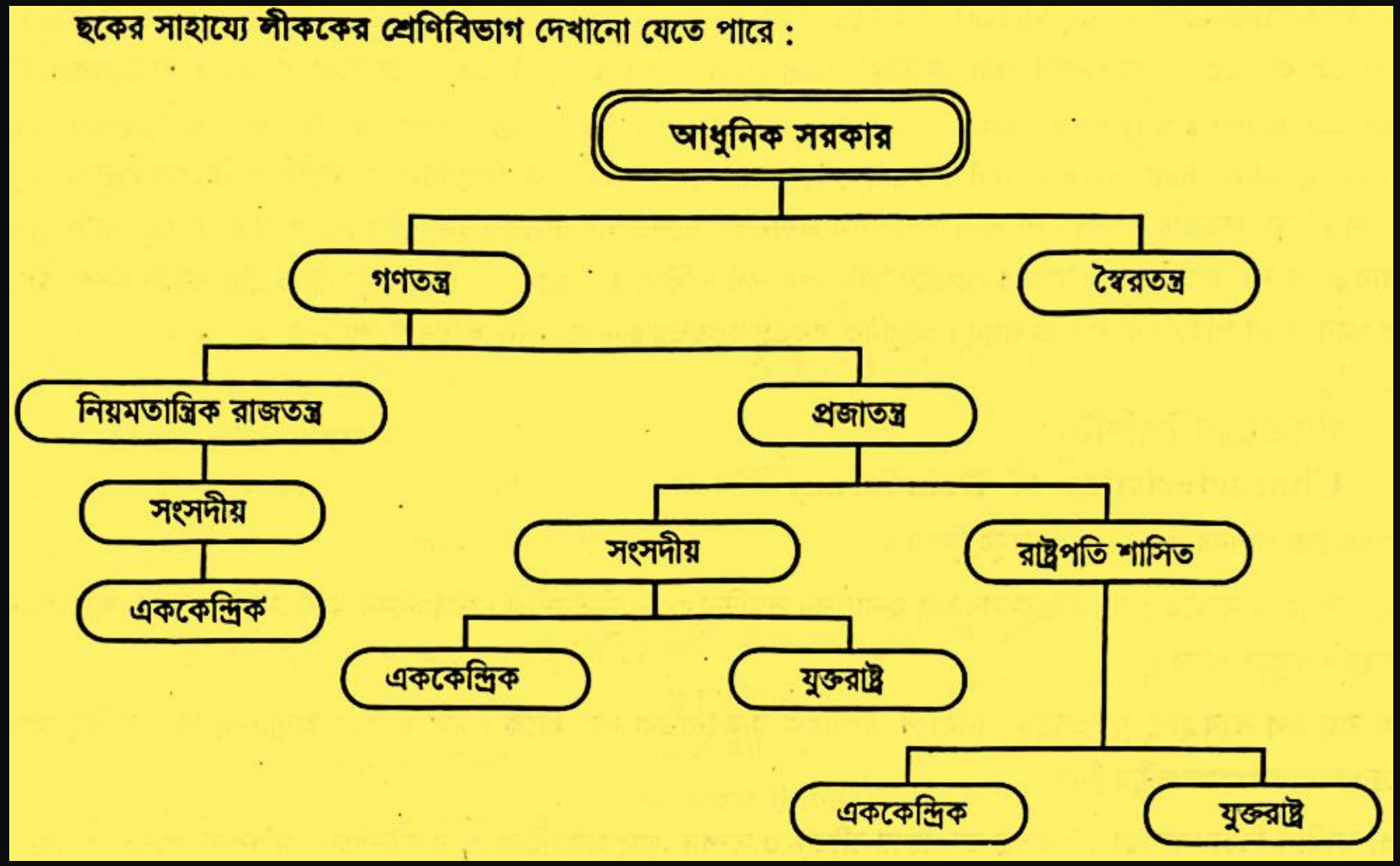

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ০২ গণতন্ত্র

গণতন্ত্র

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

গণতন্ত্র

সংজ্ঞা ও অর্থ (Definition and Meaning): গণতন্ত্র আধুনিক যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার। গণতন্ত্রে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ। গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, যা গ্রিক শব্দ Demos এবং Kratos বা Kratia থেকে উদ্ভূত। Demos অর্থ জনগণ এবং Kratos বা Kratia শব্দের অর্থ শাসন ক্ষমতা। সুতরাং শব্দগত অর্থে গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে 'জনগণের শাসন ক্ষমতা'।

গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (Herodotus) বলেন, "গণতন্ত্র এমন এক প্রকার শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা আইনত কোনো শ্রেণি বা শ্রেণিসমূহের ওপর ন্যস্ত না থেকে সমাজের সকল সদস্যদের ওপর ন্যস্ত থাকে।"

স্যার জন সীলি (Sir John Seely) বলেন, "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকার যেখানে সকলেরই অংশগ্রহণের সুযোগ আছে।" (Democracy is a government in which everyone has a share.) বার্কারের মতে, "গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার।" (Democracy is a system of government by discussion.)

অধ্যাপক ডাইসি (Prof. Dicey) বলেন, "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ।" (Democracy is a form of government in which the governing body is a comparatively large fraction of the entire population.)

গণতন্ত্র

সি. এফ. স্ট্রং (C. F. Strong) বলেন, "শাসিত জনগণের সক্রিয় সম্মতির ওপর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাকে গণতন্ত্র বলে।" (Democracy implies that government which shall rest on active consent of the governed.) গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের (Abraham Lincoln) সংজ্ঞা খুবই জনপ্রিয়। তাঁর মতে, "গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।" (Democracy is a government of the people, by the people and for the people.)

অধ্যাপক ম্যাকাইভার (Prof. Mclver)-এর মতে, "গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অন্য কারো দ্বারা শাসন পরিচালনার পদ্ধতি নয়, বরং কে বা কারা শাসন করবে এবং মোটামুটিভাবে কোন্ উদ্দেশ্যে শাসন করবে তা নির্ধারণ করার উপায়স্বরূপ।" (Democracy is not a way of governing, whether by way of majority or otherwise, but primarily a way of determining who shall govern and broadly, to what ends.) অনেক চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকে শুধু 'শাসনব্যবস্থা' বা 'সরকার ব্যবস্থা' না বলে বরং 'সমাজব্যবস্থা' বলেও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং গণতন্ত্র বলতে এমন এক শাসনব্যবস্থা বা সমাজব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, সরকার গঠন ও তা পরিচালনা করতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. জনগণের সম্মতি : গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সরকার গঠন বা পরিবর্তন করতে পারে।

২. বহু দল ব্যবস্থা: গণতান্ত্রিক সরকারে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। দল ব্যবস্থা আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রয়োজনীয় দিক।

৩. স্বাধীন বিচারব্যবস্থা: গণতন্ত্র জনগণের জীবন ও সম্পদ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা হয়। এ জন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। এর অভাবে গণতন্ত্র জনতাতন্ত্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪. নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা: গণতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন করা যায়। গণতন্ত্রে সরকার গঠন বা পরিবর্তন করা হয় নির্বাচনের মাধ্যমে।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

৫. আইনের শাসন: গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আইনের শাসন। আইনের চোখে সকলেই সমান, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে আইনের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। আইনের নিয়ম ব্যতীত কাউকে বন্দী বা আটক রাখা যায় না বা শাস্তি দেয়া যায় না।

৬. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা: স্বাধীন সংবাদপত্র বা 'ফ্রি প্রেস' গণতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সংবাদপত্রের স্বাধীন ভূমিকা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্র জনগণ ও সরকার উভয়কে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে।

৭. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার: গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়।

৮. দায়িত্বশীল সরকার: গণতন্ত্র দায়িত্বশীল শাসন। গণতান্ত্রিক সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করে বা দায়ী থাকে।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

গণতন্ত্র দু'প্রকার হতে পারে; যথা- (১) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) ও (২) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy) ।

প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে যেমন, বিশাল, জনসংখ্যায়ও তেমনি বিপুল। সুতরাং প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রভিত্তিক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে অচল। তবে সুইজারল্যান্ডের পাঁচটি ক্যান্টন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ডস্থিত কয়েকটি শহরে এখনও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আংশিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে সরকার গঠিত হয়। অর্থাৎ নাগরিকগণ পরোক্ষভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করে রাষ্ট্রশাসনে অংশগ্রহণ করে থাকে।

পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হচ্ছে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ও সরকার যেন সবসময়ই জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে এজন্য পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রেও প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কার্যকর হতে দেখা যায়। এ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে- (১) গণনির্দেশ, (২) গণউদ্যোগ, (৩) পদচ্যুতি এবং (৪) গণভোট। এ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. গণনির্দেশ (Referendum): সাংবিধানিক আইন বা সাধারণ আইন সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য জনমত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। একে বলা হয় 'গণনির্দেশ'। সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের কোনো আইন পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য গণনির্দেশ অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া সুইডেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে গণ-নির্দেশের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের (U.S.S.R) প্রেসিডিয়াম যে কোনো অঙ্গরাজ্যের অনুরোধক্রমে যেকোনো বিষয়ে গণনির্দেশনার ব্যবস্থা করতে পারতো।

২. গণউদ্যোগ (Initiative): আইন প্রণয়ন বা আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তাকে 'গণউদ্যোগ' বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে উনিশটি অঙ্গরাজ্যে এবং সুইজারল্যান্ডে এ ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

৩. পদচ্যুতি (Recall): মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে জনপ্রতিনিধিকে আস্থাভঙ্গ কিংবা গণবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করার মাধ্যমে অপসারণ করার পদ্ধতিকে 'পদচ্যুতি' বলে। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে পদচ্যুতির নিয়ম প্রচলিত রয়েছে।

৪. গণভোট বা জনমত নির্ধারণ (Plebiscite): সাধারণত যখন কোনো রাজনৈতিক বিষয় নির্ধারণের জন্য কিংবা সংবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয় তখন তাকে 'জনমত নির্ধারণ' বা কোনো কোনো সময় 'গণভোটও' বলা হয়ে থাকে। ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালে আসামের সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা সেজন্য গণভোট হয়েছিল। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিবেন কিনা এ জন্য ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'গণভোট' অনুষ্ঠিত হয়।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের গুণ

গণতন্ত্রের গুণ নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্র পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ: গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে, "যা সকলকে স্পর্শ করে তা সকলের দ্বারা নির্ধারিত হবে।" সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এ অংশগ্রহণকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান ও নিশ্চিত করা হয়।

২. বিশেষ ব্যক্তিগত মর্যাদার অনুপস্থিতি: গণতন্ত্রে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, সাধারণ-অভিজাত সকল মানুষ এক ও অভিন্ন। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়, বা কেউ বিশেষ সুবিধার অধিকারী নয়। বংশমর্যাদা অথবা ধনসম্পদের জন্য কাউকে বিশেষ মর্যাদা গণতন্ত্রে দেয়া হয় না।

৩. সাম্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ: গণতন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতার মতো মহান আদর্শে বিশ্বাসী। 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, সকল মানুষই সমান'-গণতন্ত্র এই মহান আদর্শকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত 'করার প্রচেষ্টা চালায়। গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে।

৪. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: গণতন্ত্র আইনের শাসনকে সমুন্নত রাখে। কোনো ব্যক্তিকে বিনা কারণে শাস্তি দেয়া হয় না এবং বিনা বিচারে আটক রাখা যায় না। আইনের চোখে সকল মানুষ সমান।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের গুণ

৫. জবাবদিহিতা বা দায়িত্বশীলতা: গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন সরকার তাদের কাজের জন্য আইনগত এবং নৈতিকভাবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। সরকারকে তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

৬. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি: গণতন্ত্র জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে শিক্ষিত এবং অধিকার ও দায়িত্ব সচেতন করে তোলে। গণতন্ত্রে জনগণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়। গণতন্ত্র রাজনৈতিক শিক্ষার পীঠস্থান।

৭. বিপ্লবের আশঙ্কা হ্রাস: গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় বিপ্লব বা রক্তারক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন হয় না। কেননা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীকে বিনা রক্তপাতে ক্ষমতা থেকে বিদায় করা যায় বা পছন্দনীয় দল ও ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসানো যায়।

৮. সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনের সহায়ক: গণতন্ত্র সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন গঠনে সহায়ক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন কাজে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে বলে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সবাই অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উপকৃত হয়। জনগণ নিজেরাই নিজেদের জন্য সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের গুণ

৯. ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ: গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। গণতান্ত্রিক শাসনে জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। ফলে জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ঘটে।

১০. ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ: জনগণের সচেতনতা এবং সাংবিধানিক বিধি-নিষেধের জন্য গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না। কেননা স্বেচ্ছাচারী হলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে সরকারকে নির্বাচনে পরাজয় বরণ করতে হয়।

১১. জাতীয় চরিত্র ও নৈতিক মানের উন্নতি: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে। অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি জনগণ নানাবিধ কর্তব্য পালন করে থাকে। গণতন্ত্রে জনগণ ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমষ্টির স্বার্থ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে জনগণের জাতীয় চরিত্র ও নৈতিক মানের উন্নতি ঘটে।

১২. দেশপ্রেম বৃদ্ধিতে সহায়ক: গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, জনগণ দ্বারা নির্বাচিত ও পরিচালিত সরকার। গণতন্ত্রে জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। 'সরকার তাদের নিজেদের সরকার'-এই অনুভূতি থেকে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম সৃষ্টি হয়।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের গুণ

১৩. জনসম্মতি ভিত্তিক গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় জনগণের সম্মতিক্রমে। জনসমর্থন হারালে নির্বাচনে সরকারকে পরাজিত হতে হয়। সুতরাং গণতন্ত্র হচ্ছে জনসম্মতিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা।

১৪. নমনীয় শাসনব্যবস্থা: গণতন্ত্র নমনীয় শাসনব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসক বদল করা যায়। গণতন্ত্রে শাসকগণ পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে পারে।

১৫. সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক: বার্কারের মতে, "গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার।" আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হয় বলে এরূপ সরকার জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের দোষ

গণতন্ত্রের দোষ বা ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ:

১. জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়ক নয়: গণতন্ত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পের প্রসার ঘটে না। শিল্প সাহিত্য বিকাশের জন্য যেরূপ জ্ঞানী শাসকের প্রয়োজন তা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণত মিলে না। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে না।

২. জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের অসহযোগিতা: গণতন্ত্রে বুলি-সর্বস্ব ব্যক্তিরা জনগণকে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসার সুয়োগ পায়। শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি অনেক সময় এসব মিথ্যার বেসাতি ও ডামাডোলের মধ্যে নিজেদেরকে জড়াতে চান না। এর ফলে দেশ বঞ্চিত হয় দক্ষ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সেবা থেকে।

৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সম্ভব নয়: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা গণতন্ত্রে যখন-তখন সরকারের পতন ঘটতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৪. অপচয়ের প্রশ্রয়: গণতন্ত্রে জাতীয় সম্পদের অপচয় হয়। কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়, অনেক সময় দেখা যায় তার ফল মোটেই সন্তোষজনক নয়। সরকার পরিবর্তিত হলে নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের অর্ধসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে অনীহা প্রকাশ করে।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের দোষ

৫. স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না: গণতন্ত্র সাম্য, স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের কথা বললেও বাস্তবে স্বাধীনতা হয় বিপন্ন। আইনের শাসনের বদলে জোরের শাসন, পেশির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, ভোটের ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেয়া হয় না। ফলে ধনী তথা পেশিসর্বস্ব প্রভাবশালীরাই নির্বাচিত হন। এজন্য লেকি বলেন যে, "গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠতর প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করে না, অধিকতর স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানও করে না।" গণতন্ত্রে যথার্থ আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৬. মূর্খ, অক্ষম ও অজ্ঞের শাসন: গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। গণতন্ত্রে গুণ নয় বরং সংখ্যাব ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এমিল ফ্যাগুয়ে বলেন, "গণতন্ত্র অক্ষমতার শাসন প্রণালি (The cult of Incompetence)। লেকির মতে, “গণতন্ত্র হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, অজ্ঞ ও অকর্মণ্য ব্যক্তির সরকার। কারণ এ শ্রেণির লোকই সর্বাধিক।” কার্লাইল উপহাসচ্ছলে গণতন্ত্রকে তাই 'নির্বোধের রাজত্ব' বলে অভিহিত করেছেন। (Democracy is a Government of the fools, for the fools and by the fools)

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের দোষ

৭. দলপ্রথার কুফল: আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হচ্ছে দলীয় শাসন। রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি, অনৈক্য প্রভৃতির ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

৮. গণতন্ত্র ক্ষণভঙ্গুর শাসনব্যবস্থা: গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলাদলির জন্য জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং সরকারের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। গণতন্ত্রে অনেক সময় জনমত বিভ্রান্ত হয়। মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে একটি দল সহজেই ক্ষমতায় আসতে পারে।

৯. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম: গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত শাসন। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্ব হয়। জরুরি প্রয়োজনের সময় গণতান্ত্রিক সরকার তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয় না।

গণতন্ত্রের দোষ

১০. উন্নত শিল্পকর্ম ব্যাহত হয়: গণতন্ত্রে উন্নত শিল্পকর্ম ব্যাহত হয়। স্যার হেনরি মেইন বলেন, 'গণতন্ত্র সাহিত্য- বিজ্ঞান বা সুকুমার কলার তেমন কদর করে না। অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত এই শাসনব্যবস্থা চারুকলা ও শিল্প বিষয় তেমন একটা বোঝে না'। অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত গণতান্ত্রিক শাসনামলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলার প্রসার বা বৃদ্ধির জন্য কোনো প্রকার সক্রিয় সহযোগিতা ও উৎসাহ তারা দেখায় না।

১১. স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি: বেশির ভাগ অল্পশিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার ভার থাকে। এরা স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত থাকে। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই পঙ্গু করে তোলে। অর্থলিলুতায় তারা আপাদমস্তক লিপ্ত থাকে।

গণতন্ত্রের সফলতার শর্ত

গণতন্ত্র জনপ্রিয় ও উত্তম শাসনব্যবস্থা। কিন্তু গণতন্ত্রকে কার্যকর ও সফল করতে হলে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হয়:

১. ব্যাপক শিক্ষা: গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে চাই ব্যাপক শিক্ষার প্রচলন। জন স্টুয়ার্ট মিল এজন্যই বলেছেন যে, "universal education must precede universal suffrage." অর্থাৎ "সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।" শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন, আত্মমর্যাদাবান, কর্তব্যনিষ্ঠ ও অধিকার সচেতন করে তোলে। এর ফলে গণতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সরকারে পরিণত হয়।

২. অর্থনৈতিক সাম্য: সমাজে সকলের আর্থিক সমতা বিধান করতে না পারলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। লাস্কির মতে, "অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।" রবসন-এর মতে, "গণতন্ত্র বলতে ন্যূনতম মৌলিক আর্থিক কল্যাণকে বোঝায়; কারণ অভুক্ত, গৃহহীন, রোগাক্রান্ত ও বস্ত্রহীনদের নিকট রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন।" অভাবগ্রস্ত মানুষকে অনেক সময় ভ্রান্তপথে পরিচালনা করা যায়। এজন্য অর্থনৈতিক সাম্য গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বলে বিবেচিত হয়।

৩. সামাজিক সাম্য: সামাজিক সাম্য মানুষকে যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তোলে। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে জাতি ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ দলমত নির্বিশেষে সকলকে যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সামাজিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের সফলতার শর্ত

৪. সহনশীলতা : সহনশীলতা বা পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের প্রাণ। অপরের বা অন্য দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। অন্য ব্যক্তি ও দলকে মত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করতে হবে। সহনশীল মনোভাব না থাকলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। যে সমাজের জনগণ যত বেশি সহনশীল সে সমাজ তত বেশি গণতান্ত্রিক।

৫. ভ্রাতৃত্ববোধ: গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ। জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকলে তারা একে অপরের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা বুঝতে পারবে না। অথচ গণতন্ত্রের লক্ষ্যই হলো সর্বজনীন কল্যাণ।

৬. গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য: অপরের মত ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, অপরকে মতামত ও বিশ্বাস প্রকাশের সুযোগ প্রদান, সময়মত নির্বাচন অনুষ্ঠান, জনগণের সম্মতি বা ম্যান্ডেট না পেলে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া, আইনসভায় বা আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যার সমাধান খোঁজা-এগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন সফল হয় না। তবে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য একদিনে গড়ে ওঠে না।

৭. যথার্থ আইনের শাসন: যথার্থ আইনের অনুশাসন গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আইনের চোখে সকলেই সমান। সকলেরই আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার থাকতে হবে। আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ক্ষমতাসীন সরকার প্রতিহিংসাবশত কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করতে পারে না।

গণতন্ত্রের সফলতার শর্ত

৮. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার জন্য বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। বিচারকগণ যেন ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এজন্য শাসন ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তুলতে হবে।

৯. দক্ষ ও সৎ নেতৃত্ব : দক্ষ, সৎ ও সুনিপুণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্র সফল হয়। সমাজ বা রাষ্ট্রের সমস্যা কী কী এবং কোন্ পথে এসব সমস্যার সমাধান আসতে পারে সে সম্পর্কে নেতাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি থাকতে হবে। অদক্ষ ও অসৎ নেতৃত্ব দ্বারা গণতন্ত্র কোনোদিনই সফল হতে পারে না।

১০. ত্যাগের মনোভাব: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনবোধে জনগণকে যে-কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমষ্টির স্বার্থের কথা ভাবতে হবে।

১১. সুষ্ঠু জনমত : গণতান্ত্রিক শাসন জনমতের ওপর নির্ভরশীল। নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ক্ষমতাসীন সরকার সবসময় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। সুষ্ঠু জনমত গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। এজন্য জনমত গঠনের মাধ্যমগুলোকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখতে হবে। রেডিও, টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের সফলতার শর্ত

১২. সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল: আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল জনমত গঠন করে ক্ষমতাসীন হয়। আবার ক্ষমতাসীন দল যেন জনস্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত না হতে পারে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখে।

১৩. মৌলিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা: গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। জনগণ যেন তাদের মৌলিক অধিকারগুলো উপভোগ করতে পারে সে জন্য তা সংবিধানে সন্নিবেশিত হতে হবে। এর ফলে সরকার বা কোনো শক্তি এ সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বিচার বিভাগ এগুলো রক্ষায় সচেষ্ট হবে।

১৪. জনগণের সজাগ দৃষ্টি: জনগণ যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হন এবং গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত না হন তাহলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সক্রিয় সতর্কতা বা সজাগ দৃষ্টির ওপর।

১৫. জনগণের আস্থা অর্জন: গণতন্ত্র জনগণের শাসন। যে সরকার জনগণের কল্যাণ সাধন করতে পারে সে শাসকের প্রতি শাসিত জনগণের আস্থার সৃষ্টি হয়। জনগণের আস্থা ও সন্তুষ্টির উপরই গণতান্ত্রিক শাসনের সাফল্য নির্ভর করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ০৩ প্রজাতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

প্রজাতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রজাতন্ত্র

যে শাসনব্যবস্থা বা সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, তাকে 'প্রজাতন্ত্র' বলে। প্রজাতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক সরকারেরই একটি রূপ। তবে সব প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি একইরূপ নয়। কোনো কোনো প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। এভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানগণ সাধারণত আইনসভার সদস্য নন। অতীতে বাংলাদেশে এভাবে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হতেন। তবে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভোটে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিও পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। সে দেশের জনগণ প্রথমে একটি নির্বাচকমণ্ডলী বা নির্বাচক সংস্থাকে নির্বাচন করে। তাঁরাই পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে।

রাজতন্ত্রের পতনের বা ক্রমবিলুপ্তির ফলে পৃথিবীতে এখন গণতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। পৃথিবীতে নামমাত্র কয়েকটি দেশে 'নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রকে কার্যকর করার চেষ্টা এখনও চালানো হচ্ছে। এছাড়া পৃথিবীর বাদবাকি সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্রের বিপরীতধর্মী শাসনব্যবস্থা হলো একনায়কতন্ত্র। একনায়কতন্ত্র হলো এমন একধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি, এক দল বা একনায়কের হাতে কুক্ষিগত থাকে। একনায়কতন্ত্রে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ কঠোর হাতে দমন করা হয়। সংবাদপত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা হয়। একনায়কের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা সহ্য করা হয় না। কোনো বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে দেয়া হয় না। অধ্যাপক নিউম্যান (Newman) এর মতে, "একনায়কতন্ত্র বলতে আমরা এমন এক ধরনের শাসনকে বুঝি যেখানে এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করে এবং বাধাহীন ও একচেটিয়াভাবে তা প্রয়োগ করে থাকে" (By dictatorship we understand the rule of a person or group of persons who arrogate to themselves and monopolise power in the state, exercising it without restraint). 'A Dictionary of Political Thought' গ্রন্থে রজার স্ফুটন (Roger Scruton) বলেছেন যে,

একনায়কতন্ত্র

“একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকারব্যবস্থা যেখানে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, গোষ্ঠী বা দল সকল রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে এবং সকল নাগরিকের নিকট থেকে আনুগত্য আদায় করে" (Dictatorship is a system of government in which one person, office, faction or party is empowered to dictate all political action and compel obedience from all other citizens)। আধুনিক যুগে গণতন্ত্রের সমাধির উপর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্পেনে ফ্রাঙ্কো, জার্মানিতে হিটলার ও ইতালিতে মুসোলিনী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব দেশে সাধারণত সামরিক জান্তারা ক্ষমতা দখল করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করে। একনায়কতন্ত্র "এক জাতি, এক দল ও এক নেতা"- এই নীতিতে বিশ্বাসী।

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. এক ব্যক্তির শাসন: একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত কর্তৃত্ব এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে। একনায়ক সমস্ত ক্ষমতার উৎস। একনায়ক তার কাজের জন্য কারো নিকট জবাবদিহি করেন না। একনায়ক ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে।

২. একদলীয় শাসন: একনায়কতন্ত্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। সে দল হচ্ছে একনায়কের নিজস্ব দল। বিরোধী দল ও মতকে নির্মমভাবে দমন ও নির্মূল করা হয়।

৩. বল প্রয়োগ: একনায়কগণ যুক্তির জোর অপেক্ষা জোরের যুক্তিতে বিশ্বাসী। একনায়কতান্ত্রিক সরকার বলপ্রয়োগ করে সকল বিরোধী মত ও বক্তব্যকে নির্মমভাবে দমন করে। এজন্য একনায়কগণ বিশেষ বাহিনী বা গুপ্ত পুলিশ বাহিনী গঠন করে থাকে।

৪. ক্ষমতার অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয়করণ: একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিশেষ করে একনায়কের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। একনায়কই সকল ক্ষমতার উৎস।

৫. প্রহসনমূলক আইনসভা: একনায়কতন্ত্রের একটি প্রহসনমূলক আইনসভা থাকে। মূলত এই আইনসভা নামমাত্র। একনায়কের ইচ্ছার অনুকূলে আইন প্রণয়ন করা এবং সর্বক্ষেত্রে তাকে সমর্থন দান করাই এই আইনসভার একমাত্র লক্ষ্য।

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

৬. প্রচারযন্ত্রের একচেটিয়া ব্যবহার: একনায়কগণ রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রচারযন্ত্রের সব বিভাগে শুধু একনায়কের জয়গান গাওয়া হয়। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিতে কড়াকড়িভাবে সেন্সরশীপ অর্থাৎ সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

৭. একক আদর্শবাদ: একনায়কতন্ত্র বিশেষ কোনো একটি আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী হয়। একনায়ক যে আদর্শে বিশ্বাস করেন, সরকারি প্রচারযন্ত্রে শুধু তারই জয়গান গাওয়া হয়। এরূপ বিশ্বাস বা আদর্শের বিরোধীদেরকে নির্মমভাবে দমন ও নির্মূল করা হয়।

৮. সর্বাত্মকবাদী: একনায়কতন্ত্র সর্বাত্মকবাদী শাসন। মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদের শ্লোগান ছিল "সব কিছুই রাষ্ট্রের মধ্যে, রাষ্ট্রের বাইরে কিছু নয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও কিছু থাকতে পারে না।" (All within the state, none outside the state, none against the state.) একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র একটি সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি ও সমাজের সকল দিক রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

৯. যুদ্ধবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী: একনায়কতন্ত্র যুদ্ধপ্রিয় এবং সাম্রাজ্যবাদী। একনায়কগণ শান্তিতে বিশ্বাস করেন না। তারা যুদ্ধকে অপরিহার্য মনে করতেন। মুসোলিনীর মতে, "নারীর নিকট মাতৃত্ব যেমন অপরিহার্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি অপরিহার্য।" (War is to man what maternity is to woman.) একনায়কতন্ত্র যুদ্ধবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের পথও প্রশস্ত হয়। মুসোলিনীর মতে, "সাম্রাজ্যবাদ জীবনের চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম" (Eternal and immutable law of life.)। হিটলার ও মুসোলিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রধানত দায়ী।

১০. শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার বিরোধী: একনায়কতন্ত্র আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করে না। শান্তি পছন্দ করে না। মুসোলিনী আন্তর্জাতিক শান্তিকে 'ভীরুর স্বপ্ন' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। 'বিশ্বশান্তির' প্রতি হিটলারের ঘৃণা সর্বজনবিদিত।

১১. উগ্র জাতীয়তাবাদী: একনায়কতন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। 'এক জাতি, এক নেতা, এক দেশ'-এটাই হলো একনায়কতন্ত্রের মূলমন্ত্র। হিটলার মনে করতেন "জার্মান জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ সুতরাং তাদের অধিকার রয়েছে পৃথিবীকে শাসন করার।"

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১২. ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিরোধী: একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী। একনায়কতন্ত্রের নীতি হলো "ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের জন্যই ব্যক্তি"। ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিবর্তে একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি পূজা ও রাষ্ট্রের পূজাকে উৎসাহিত করে।

১৩. দায়িত্বহীনতা: একনায়কতন্ত্রে দায়িত্বশীলতার কোনো স্থান নেই। সরকার জনগণের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু জনগণের কাছে কোনোভাবে দায়ী থাকে না। সরকার গঠন অথবা সরকার অপসারণে জনগণ প্রকৃতপক্ষে কোনো সাংবিধানিক উপায় খুঁজে পায় না।

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্রের গুণ

একনায়কতন্ত্রের গুণাবলি নিম্নরূপ:

১. দ্রুত নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা: একনায়কতন্ত্র দ্রুত নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সাধারণত যেসব সমাজ বা রাষ্ট্র নানা কারণে অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার শিকার, একনায়ক সেখানে তাঁর সীমাহীন শক্তি দিয়ে শৃঙ্খলা বিধানে সমর্থ হয়।

২. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি: একনায়কতন্ত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্রকে দ্রুত উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম। অসীম ক্ষমতার অধিকারী একনায়কের কাজ বা পরিকল্পনায় কেউ বাধা দিতে পারে না বলেই এটা সম্ভব হয়।

৩. জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা: যে জাতি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নিয়ে একমত নয়, দল এবং উপদলে বিভক্ত, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত, রাষ্ট্রীয় সংহতির নিদারুণ অভাব, সেখানে একনায়ক জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্রের গুণ

৪. অর্থের অপচয় হয় না: একনায়কতন্ত্রে সংগঠনের সরলতা এবং সরকারের স্থায়িত্বের জন্য অর্থের অপচয় কম হয়।

৫. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব: একনায়কতন্ত্রে সরকার স্থায়ী হয়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

৬. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম: একনায়কতন্ত্র দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। এর ফলে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় একনায়কতন্ত্র সফল ভূমিকা পালন করতে পারে।

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্রের দোষ বা ত্রুটি

একনায়কতন্ত্রের ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ :

১. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার: একনায়কতন্ত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। একনায়ক জনগণের সম্মতির কোনো তোয়াক্কা করে না। একনায়কের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে সহনশীলতার কোনো স্থান নেই।

২. দায়িত্বশীলতার অভাব: একনায়কতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতা নেতা ও দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্ম নেয় না। জনগণ সুনাগরিকের গুণাবলির চর্চা ও অর্জনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

৩. প্রগতি বিরোধী: একনায়কতন্ত্র প্রগতি বিরোধী। একনায়কতন্ত্র ভিন্ন মত ও আদর্শকে কঠোরভাবে দমন করে। নতুন ও প্রগতিশীল আদর্শকে একনায়ক সাধারণত সন্দেহের চোখে দেখে।

৪. বিপ্লবের সম্ভাবনা: একনায়কতন্ত্র বিপ্লবের আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। কেননা বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা থেকে বাধ্য হয়ে বিরত থাকে। এরা গোপনভাবে তৎপরতা চালায় এবং জনগণকে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে। ফলে একনায়কতন্ত্রে বিপ্লবের সম্ভাবনা অধিক।

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্রের দোষ বা ত্রুটি

৫. দুর্নীতির প্রসার: একনায়কতন্ত্র সীমাহীন দুর্নীতির জন্ম দেয়। কারও নিকট জবাবদিহি করতে হয় না বলে একনায়ক দুর্নীতিতে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে। লর্ড এ্যাকটন এজন্যই বলেছেন যে, "সাধারণত ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং সীমাহীন ক্ষমতা মানুষকে সীমাহীন দুর্নীতিগ্রস্ত করে" (Power corrupts men and absolute power corrupts absolutely.) এ সম্বন্ধে প্রফেসর লাস্কির কথা আরও বেশি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "ক্ষমতার এমনি অভ্যাস যে এমনকি মহান ব্যক্তিদেরকেও তা কলুষিত করে" (Power has the habit of corrupting even the noblest of those who exercise it.) ।

৬. স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর: একনায়কতন্ত্র এক ব্যক্তি ও একদলের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। একনায়কগণ সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। তারা খেয়াল খুশিমত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকেন।

৭. সাম্য ও স্বাধীনতা বিরোধী: একনায়কতন্ত্র সাম্যে বিশ্বাস করে না। স্বাধীনতার প্রতি একনায়কতন্ত্র শ্রদ্ধা পোষণ করে না। শাসকের পছন্দই একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি।

একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসন ব্যবস্থা। উভয়ের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

১. শাসকের সংখ্যা: গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন; কিন্তু একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এক ব্যক্তি বা এক দলের শাসন।

২. ক্ষমতার উৎস: গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস জনগণ, কিন্তু একনায়কতন্ত্রের ক্ষমতার উৎস এক ব্যক্তি বা একটি দলীয় চক্র।

৩. ব্যক্তির ভূমিকা ও স্থান: গণতন্ত্রে ব্যক্তির প্রাধান্যই প্রবল; একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রই চরম ও চূড়ান্ত। ব্যক্তির ভূমিকা সেখানে গৌণ।

৪. ব্যক্তিস্বাধীনতা: গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী; অপরদিকে একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী। ব্যক্তিস্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। গণতন্ত্র আছে বলেই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা পায়। একনায়কতন্ত্র মুক্ত বুদ্ধি ও বিবেকের স্বাধীনতার বিরোধী।

একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা

৫. আইনসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা: গণতন্ত্রে আইনসভা সার্বভৌম; কিন্তু একনায়কতন্ত্রে আইনসভা একটি প্রহসনমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার নিকট শাসন বিভাগকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। আইনসভার দ্বারাই মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং আইনসভার আস্থা হারালে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে আইনসভা নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী।

৬. শান্তি, যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদ: গণতন্ত্র শান্তিতে বিশ্বাসী; কিন্তু একনায়কতন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধবাদে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রের লক্ষ্য হলো মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা; কিন্তু একনায়কতন্ত্র উগ্র সমরবাদে বিশ্বাসী। জার্মান একনায়ক হিটলার সব সময় বলতেন, 'যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সর্বজনীন।" ইতালির একনায়ক বেনিতো মুসোলিনী বলতেন, "এককালীন শান্তি সম্ভবও নয়, সংগতও নয়।"

৭. সর্বাত্মকবাদ : গণতন্ত্র সর্বাত্মকবাদকে ঘৃণা করে; কিন্তু একনায়কতন্ত্র সর্বাত্মকবাদকে প্রশ্রয় দেয়। গণতন্ত্রে ব্যক্তিই মুখ্য, রাষ্ট্র গৌণ। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি গৌণ, রাষ্ট্রই মুখ্য। "সবকিছুই রাষ্ট্রের জন্য, কোনো কিছুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা বাইরে নয়"-এরূপ চরম ও সর্বাত্মক ধারণাই একনায়কতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা

৮. দলের সংখ্যা: গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান থাকে; কিন্তু একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এক দলীয় শাসন। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ায় গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এসব মৌলিক অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় বিরোধী দল গড়ে উঠতে পারে না।

৯. নেতৃত্ব : গণতন্ত্র যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাসী; কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এক ব্যক্তির নেতৃত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এক নেতার নেতৃত্ব গড়ে তোলা হয়।

১০. প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা: গণতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমগুলো স্বাধীন ও মুক্ত থাকে। এগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুব অল্প পরিমাণই লক্ষ করা যায়। অপরদিকে একনায়কতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমগুলোর ওপর ক্ষমতাসীন সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহার: সুতরাং গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, একনায়কতন্ত্রের এমন কতগুলো দোষ-ত্রুটি রয়েছে যা একনায়কতন্ত্রের গুণগুলোকেও ম্লান করে দেয়। অপরদিকে গণতন্ত্রের গুণগুলোর তুলনায় ত্রুটিগুলো নেহায়েতই অকিঞ্চিৎকর ও গৌণ। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকলে এ ত্রুটিগুলোর প্রতিকার করা সম্ভব। নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রকে তাই সকল শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ০৪ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়; যথা: (১) সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার, এবং (২) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রচলিত রয়েছে গ্রেটব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ, জাপান প্রভৃতি দেশে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে, তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। এ.ডি. ডাইসি (A.V. Dicey)-এর মতে, 'মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার গড়ে ওঠে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের একত্রীকরণের ভিত্তিতে এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।" অধ্যাপক গার্নার-এর মতে, "সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা, যেখানে প্রকৃত শাসক বা মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে।" সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসনব্যবস্থায় একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার হাতে। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মন্ত্রিসভার নেতা, সংগঠক ও সরকারপ্রধান। অধ্যাপক গ্রেভাস (Prof. Greavas)-এর মতে 'সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার হলো রাষ্ট্রের প্রভু বা শাসক এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন ঐ সরকারের প্রভু বা প্রধান' (In Parliamentary system, the government is the master of country and Prime Minister is the master of the government.)।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার

মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে। আইনসভার অনাস্থা প্রকাশ পেলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য। মন্ত্রিগণ ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করেন। শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা জনগণের প্রতিনিধিসভা অর্থাৎ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলে এই সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা হয়ে থাকে। গ্রেটব্রিটেন, ভারত, বাংলাদেশ, জাপান, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার

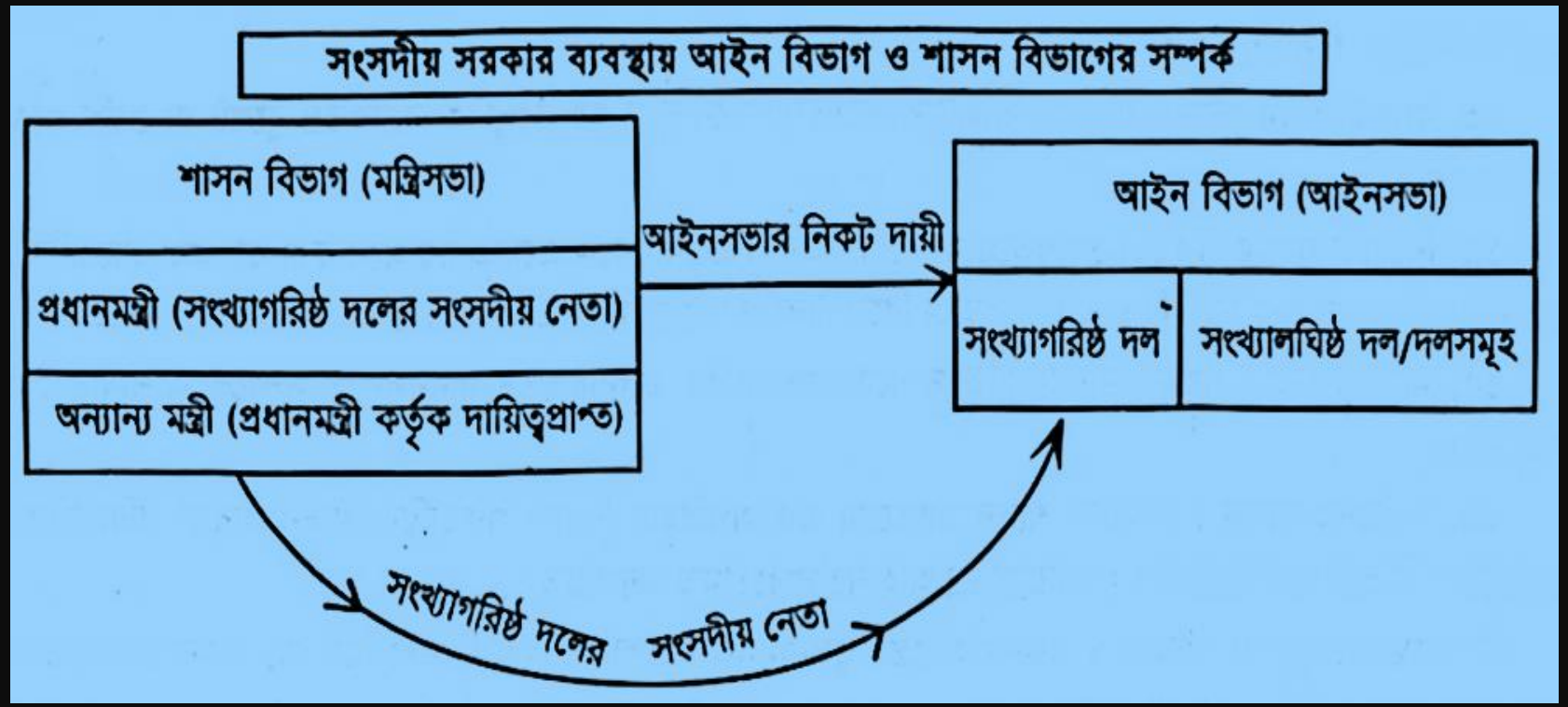

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. সংসদের প্রাধান্য: সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে সংসদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা শাসন কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

২. ক্ষমতার একত্রীকরণ: সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় শাসন ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতার একত্রীকরণ ঘটে। আইন পরিষদের একটি অংশ নিয়ে মন্ত্রিসভা বা শাসন বিভাগ গঠিত হয়। ফলে একই ব্যক্তির হাতে আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়।

৩. নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান: সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক শাসক। প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে। রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া সাধারণত কিছু করেন না।

৪. দায়িত্বশীল শাসন: মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে আইন পরিষদের নিকট দায়ী। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

৫. মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য: সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। কোনো মন্ত্রী আইনসভার সদস্য না হলে তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হতে হয়।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণ

১. শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক: সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে। মন্ত্রিসভা অতি সহজে আইন পরিষদে আইন পাস করে নিতে পারে। কেননা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য।

২. দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা: সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক। শাসন বিভাগ তাদের স্থায়িত্ব এবং কার্যকালের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। এ জন্য সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়ে থাকে।

৩. নমনীয়তা: সংসদীয় সরকার নমনীয়। কেননা প্রয়োজনবোধে যেকোনো সময়ে সাধারণ নির্বাচন ছাড়াও মন্ত্রিসভার পরিবর্তন করা যায়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আইন ও সংবিধান পরিবর্তন করা যায়।

৪. মর্যাদাসম্পন্ন বিরোধী দল: মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে বিরোধীদলকে 'বিকল্প সরকার' বলে বিবেচনা করা হয়। বিরোধীদলও গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা দ্বারা সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ তুলে ধরে।

৫. যৌথ নেতৃত্ব: প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় যৌথ নেতৃত্বের ধারণা বিকশিত হয়। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণ

৬. নাগরিক সচেতনতা বিকাশে সাহায্য করে: এই শাসনব্যবস্থায় জনগণ গভীর আগ্রহের সাথে আইনসভার অধিবেশনের খবরাখবর বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে পড়েন, শুনেন ও দেখেন। এর ফলে জনগণ নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

৭. সুষ্ঠু শাসন প্রতিষ্ঠা: শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকায় এ সরকারব্যবস্থা সুষ্ঠু শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

৮. স্বৈরাচার বিরোধী: সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় গৃহীত নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য শাসন বিভাগকে আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকতে হয়। এর ফলে শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী হতে পারে না।

৯. দ্রুত আইন প্রণয়ন: এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য। প্রধানমন্ত্রী শুধু মন্ত্রিসভার নেতা নন আইনসভারও নেতা। ফলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা অতি সহজে দ্রুত আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়।

১০. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বজায় রাখা যায়: সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বহাল রাখা যায়। গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানসহ অনেক রাষ্ট্রে এটা সম্ভব হয়েছে।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের ত্রুটি

সংসদীয় সরকারের ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ :

১. স্থিতিশীলতার অভাব: সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা যে-কোনো সময় অনাস্থা প্রস্তাব এনে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করতে পারে। ফলে সরকারের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

২. জরুরি অবস্থায় অনুপযোগী: সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সকল সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার দীর্ঘ আলোচনার পর গৃহীত হয়। এজন্য সরকার জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য অনুপযোগী।

৩. দলাদলি : সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা অনেক সময় দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য পায়। গঠনমূলক সমালোচনার পরিবর্তে 'বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা' নীতি বা দলাদলি প্রাধান্য পায়।

৪. মন্ত্রিপরিষদের একনায়কত্ব: সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় দলীয় শৃঙ্খলার কারণে 'আইনসভার সার্বভৌমত্ব' প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বাস্তবে 'মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

৫. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি: সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য। ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয় না।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের ত্রুটি

৬. অস্থিতিশীল যুক্তফ্রন্ট গঠনের ঝুঁকি: সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় অনেক সময় কোনো দলের পক্ষেই একক দলীয়মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয় না। তখন সমমনা কয়েকটি দলের উদ্যোগে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এরূপ 'কোয়ালিশন সরকার' স্থিতিশীল হয় না।

৭. সদ্য স্বাধীন ও অনুন্নত দেশের জন্য অনুপযোগী: সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে যেখানে শিক্ষিত জনগণের সংখ্যা কম, সুনাগরিকের অভাব রয়েছে; জনগণ রাজনৈতিক দিক থেকে অসচেতন ও অসহিষ্ণু, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নেই, সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল নেই; সেসব দেশে এ ধরনের সরকার সফল হবার সম্ভাবনা কম।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

যেসব রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং তিনি সাধারণত আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন না-তখন তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে। অধ্যাপক জে. ডব্লিউ গার্নার (Prof. J.W. Garner) বলেন, "যে শাসনব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ তাদের কার্যকালের মেয়াদ এবং কার্যাবলির জন্য আইনসভার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে, তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।" (Presidential form of government is a government in which the executive is independent of the legislature as regards its tenure and to a large extent as regards its policy and acts) I

অধ্যাপক এফ. আর. সিলি (Prof. F.R. Seeley)-এর মতে, "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছায় পরিচালিত সরকার হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।" (The Presidential form of government is basically based on the will of the President elected by the people directly or indirectly in a democracy.) ।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

আর. এন. গিলক্রিস্ট (R.N. Gilchrist) বলেন, "রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার হলো ঐ সরকারব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত এবং রাষ্ট্রপতি তার কাজের জন্য আইন পরিষদের প্রভাবমুক্ত।" রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধান। তাকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকে। রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিমত মন্ত্রী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, ব্রাজিল প্রভৃতি - রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রচলিত রয়েছে।

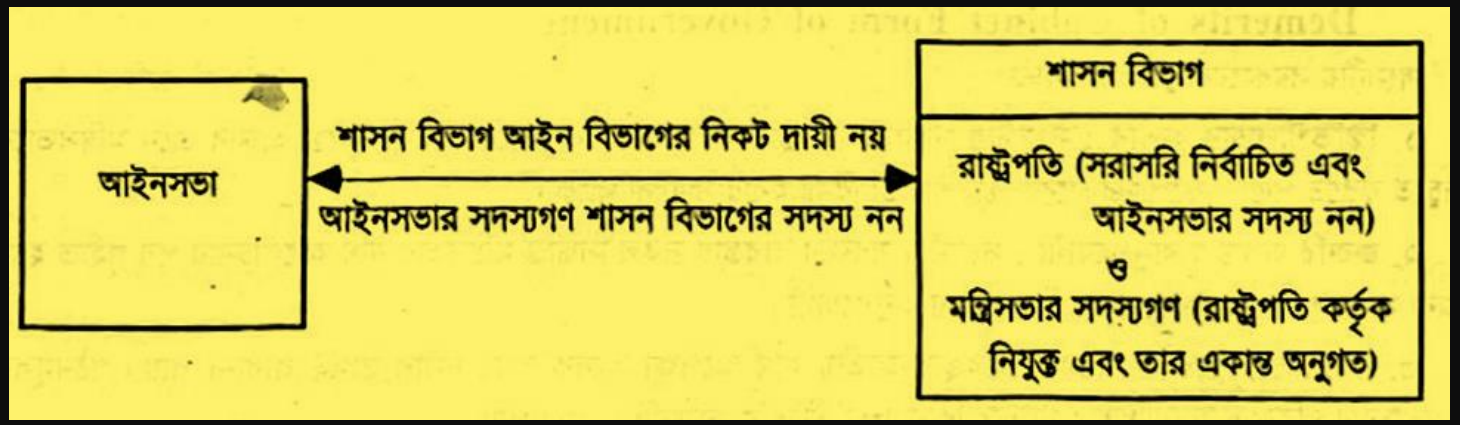

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাররে বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক: এরূপ সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান নামে ও কাজে রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রকৃত শাসক। তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হন।

২. আজ্ঞাবহ মন্ত্রিসভা: মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিগণ তাঁদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি যে কোনো ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিয়োগ এবং যে কোনো মন্ত্রীকে যেকোনো সময় মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করতে পারেন।

৩. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি: রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপতি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিসভা শাসন ক্ষমতা পরিচালনার জন্য সাধারণত আইনসভার নিকট দায়ী নন। শাসন বিভাগ আইনসভা ভেঙে দেয়ার অধিকার রাখে না। আইনসভা ও শাসন বিভাগ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে।

৪. শাসন বিভাগ সাধারণত আইনসভার নিয়ন্ত্রণমুক্ত: আইনসভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না। কেবল বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁকে অভিশংসনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব। সাধারণভাবে তিনি আইনসভার নিকট দায়ী নন। আবার তিনি আইনসভাকেও ভেঙে দিতে পারেন না।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাররে বৈশিষ্ট্য

৫. সরকার স্থিতিশীল হয়: এই সরকার ব্যবস্থায় সরকার স্থিতিশীল হয়। কেননা রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। অভিশংসন প্রস্তাব ছাড়া আইনসভা রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না।

৬. বিচার বিভাগের প্রাধান্য: রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর থাকায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য থাকে।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাররে গুণ

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণসমূহ নিম্নরূপ:

১. দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ: রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার দ্রুত, কার্যকর ও জোরালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেননা এ সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আইনসভার মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয় না।

২. স্থায়িত্ব: এ সরকার তুলনামূলকভাবে স্থায়ী। যখন-তখন সরকার পরিবর্তনের মতো দুরবস্থার শিকারে পরিণত হতে হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নির্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে সরকার পরিচালনা করেন।

৩. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী: যেসব অনুন্নত দেশে সুষ্ঠু দ্বিদলীয় ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি সেসব দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

৪. আইনসভার প্রভাবমুক্ত শাসন বিভাগ: রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রিগণ সংসদ সদস্যদের চাপমুক্ত থাকে। এর ফলে তারা নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সরকারের নিয়ম-নীতি প্রয়োগ করতে পারে।

৫. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুফল ভোগ: রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। এর ফলে জনগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাররে গুণ

৬. জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় উপযোগী: আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত হবার ফলে যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সংকট ও জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় রাষ্ট্রপতি এককভাবে এবং অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেন।

৭. বহুদলীয় ব্যবস্থায় উপযোগী: বহুদলীয়-ব্যবস্থায় যখন এককভাবে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না, তখন 'কোয়ালিশন সরকার' গঠন করতে বাধ্য হয়। কোয়ালিশন সরকার দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গঠিত হলে সরকার স্থায়ী ও শক্তিশালী হয়।

৮. দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটে: রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের মন্ত্রীপদে নিয়োগদান করতে পারেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে আইনসভার বা দলীয় সিদ্ধান্তের বা সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হয় না। ফলে দেশ দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সেবা ও সহযোগিতা পায়।

৯. দলীয় মনোভাব প্রশমিত হয়: রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি নিজের পছন্দমত মন্ত্রী নিয়োগ করেন। মন্ত্রিগণ আইনসভার পরিবর্তে সরাসরি রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। আইন পরিষদের আস্থা-অনাস্থার ওপর শাসন বিভাগকে তাই নির্ভরশীল থাকতে হয় না। এর ফলে রাষ্ট্রপরিচালনায় দলীয় মনোভাব অনেকটা প্রশমিত হয়।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাররে দোষ

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দোষগুলো নিম্নরূপ:

১. শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব: সরকারের প্রতিটি বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় শাসন ও আইন বিভাগ পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন। ফলে সরকার পরিচালনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। জরুরি অবস্থায় এই অচলাবস্থা দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়।

২. বিপজ্জনক: রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে একমাত্র অভিশংসন প্রস্তাব উত্থাপন ও কার্যকর করা ছাড়া ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব নয়। জরুরি প্রয়োজনে সরকার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও তা সম্ভব হয় না। ফলে এ সরকার বিপজ্জনক।

৩. অনমনীয়তা: এ সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি অযোগ্য প্রমাণিত হলেও তাকে সহজে পরিবর্তন সম্ভব নয়। কেননা রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। অনমনীয়তার জন্য এ সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে অনেক সময় তাল মিলিয়ে চলতে পারে না।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাররে দোষ

৪. স্বেচ্ছাচারী শাসন: রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় সমস্ত শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হওয়ায় তিনি অনেক সময় একনায়কে পরিণত হতে পারেন। আইনসভার নিকট দায়ী নন বলে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন।

৫. সরকার দায়িত্বহীন হয়: রাষ্ট্রপতি তাঁর কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। ফলে এই সরকার দায়িত্বহীন হতে পারে।

৬. আইন প্রণয়নে অসুবিধা: রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য না হওয়ায় সরাসরি আইন প্রণয়ন কিংবা তা সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাঁদের নির্ভর করতে হয় আইন পরিষদে দলীয় সদস্যদের ওপর। কোনো কোনো সময় এমন আইন পাস করা হয় যা হয়ত মন্ত্রীরা চান না, অথবা রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীরা যে আইন প্রণয়ন করতে চান আইনসভার সদস্যগণ তা চান না।

৭. আইন প্রণয়নে নেতৃত্বের অভাব: রাষ্ট্রপতি ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। এর ফলে আইন প্রণয়নে তারা নেতৃত্ব প্রদান করতে পারেন না। আইন প্রণয়নে নেতৃত্বের অভাবে দ্রুত ও ফলপ্রসূ আইন প্রণীত হয় না।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাররে মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গণতান্ত্রিক সরকার হলেও উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যসমূহ লক্ষ করা যায়:

১. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা: সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেন, অপর জন সরকার পরিচালনা করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান, তিনিই সরকারপ্রধান। রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক।

২. মন্ত্রীদের মর্যাদা ও ক্ষমতা: সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী এবং বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ কর্মচারীমাত্র।

৩. মন্ত্রীদের আইনসভার সদস্য হওয়া: সংসদীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। আইনসভার সদস্য নন এমন ব্যক্তি মন্ত্রী হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাঁকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মন্ত্রিগণ সাধারণত আইনসভার সদস্য নন।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাররে মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

৪. আইন প্রণয়নে সরাসরি ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে: সংসদীয় বা মন্ত্রিসভা 'শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য। তারা সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী আইনসভার বা সংসদের নেতা। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য নন। তারা সরাসরি আইন প্রণয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না।

৫. পদচ্যুতি প্রসঙ্গে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে আইনসভা যে কোনো সময় অনাস্থা প্রস্তাব এনে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তার সন্তুষ্টির ওপর ক্ষমতায় থাকেন। এক্ষেত্রে আইনসভা মন্ত্রীদের পদচ্যুত করতে পারেন না। মন্ত্রীরা পদচ্যুত হন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাররে মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

৬. আইনসভার সার্বভৌমত্ব: সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের আইনসভা সার্বভৌম। আইনসভা ইচ্ছা করলে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে সরকারকে অপসারণ করতে পারে। আইনসভা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়। আইনসভা সংবিধান নির্দিষ্ট পথে বিশেষ অভিযোগ উত্থাপন ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন ও অপসারণ করতে পারে না। রাষ্ট্রপতির হাতে 'ভেটো' ক্ষমতা থাকায় আইন পরিষদের সার্বভৌম ক্ষমতা আরো সঙ্কুচিত হয়েছে।

৭. আইনসভার নিকট জবাবদিহিতা : সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা তাদের সকল নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ সাধারণত আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ০৫ এককেন্দ্রিক সরকার

এককেন্দ্রিক সরকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

এককেন্দ্রিক সরকার

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের সরকারকে বোঝায় যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে। এখানে প্রাদেশিক সরকার বা অঙ্গরাজ্য সরকার থাকতে পারে, কিন্তু আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো সাংবিধানিক স্বাধীনতা ভোগ করে না। গোটা দেশ একটি কেন্দ্র থেকে শাসিত হয় বলে এ ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, জাপান, ইতালি প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে।

অধ্যাপক ডাইসি (Prof. Dicey)-এর মতে "এককেন্দ্রিকতা হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত আইন বিভাগীয় ক্ষমতার স্বাভাবিক ব্যবহার" (Unitarism is the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power.)

অধ্যাপক গেটেল (Prof. Gettel)-এর মতে, "এককেন্দ্রিক সরকার হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সংবিধান রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা জাতীয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করে।" (Unitary government is a system in which the constitution of the state delegates all government powers to the national government.)

এককেন্দ্রিক সরকার

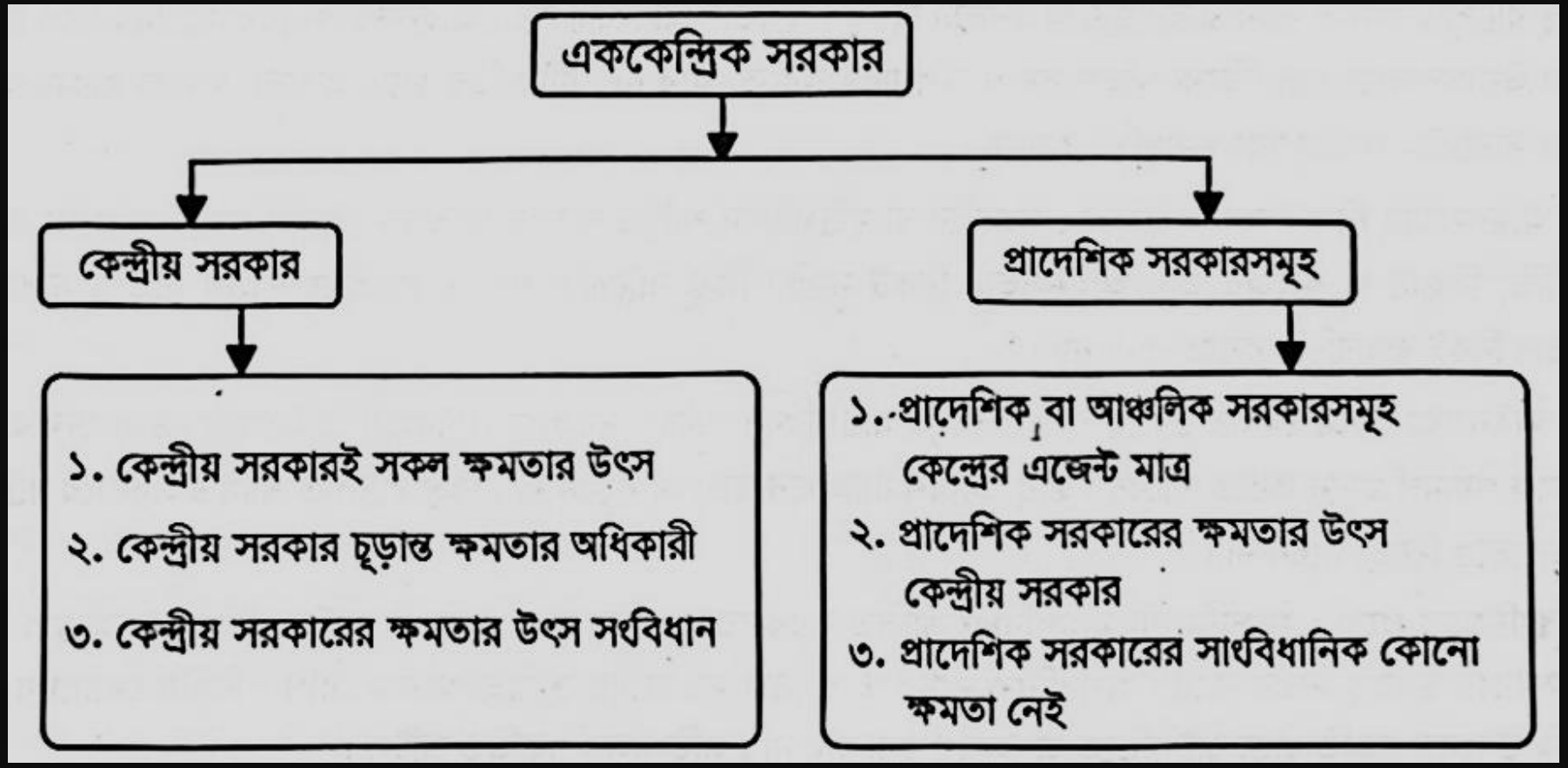

এককেন্দ্রিক সরকার

এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য

এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. একক আনুগত্য : এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ শুধু কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে।

২. কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা: এককেন্দ্রিক সরকারে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকার থাকলেও তা ক্ষমতা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন: এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার খেয়াল-খুশিমত প্রদেশে বা অঞ্চলগুলোর ক্ষমতা কমাতে বা বাড়াতে পারে।

৪. প্রদেশগুলো কেন্দ্রের এজেন্ট মাত্র এককেন্দ্রিক সরকারে প্রদেশগুলো কেন্দ্রের 'এজেন্ট' হিসেবে কাজ করে। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে।

৫. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব: এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রদেশগুলো বা অঞ্চলগুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে না। কেননা কেন্দ্রীয় সরকার ওদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

৬. সুপরিবর্তনীয় সংবিধান: এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান সাধারণত সুপরিবর্তনীয় হয়। সংবিধান সংশোধনের জন্য কোনো জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না।

এককেন্দ্রিক সরকার

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপ:

১. নমনীয়: এককেন্দ্রিক শাসন ব্যববস্থা নমনীয়। কেননা কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

২. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব: এককেন্দ্রিক সরকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয় বলে বলিষ্ঠ ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব।

৩. অপচয় রোধ : এই শাসনব্যবস্থা সরকারি খরচের অপচয় রোধ করে। এককেন্দ্রিক সরকার সহজ-সরল রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলে। ফলে অপচয় রোধ হয়।

৪. ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে উপযোগী: অপেক্ষাকৃত ছোট বা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে এই শাসনব্যবস্থা উপযোগী।

এককেন্দ্রিক সরকার

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ

৫. রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা: কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য সৃষ্টি করা সহজ হয়। জনগণ আঞ্চলিক আনুগত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় না।

৬. সুষ্ঠু শাসনের নিশ্চয়তা: এই শাসনব্যবস্থা সাংবিধানিক সংকট ও প্রশাসনিক জটিলতা থেকে মুক্ত। ফলে সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা নিশ্চিত হয়।

৭. জাতীয় সংহতি : এই শাসনব্যবস্থায় দ্বিনাগরিকত্বের অবকাশ নেই বলে সুসংহত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এতে জাতীয় সংহতি জোরদার হয় এবং জনগণ গভীর ভ্রাতৃত্ব ও একতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

৮. সহজ-সরল গঠন প্রকৃতি: এককেন্দ্রিক সরকারের গঠন পদ্ধতি সহজ, সরল। একটি মাত্র সরকার এবং একক আনুগত্য থাকায় ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত জটিলতা থাকে না।

এককেন্দ্রিক সরকার

এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ

এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ:

১. স্বায়ত্তশাসন বিরোধী: এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে। স্থানীয় উদ্যোগের অভাবে স্থানীয় সমস্যাবলি যথাযথভাবে চিহ্নিত বা সমাধা হয় না। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসন বিরোধী।

২. স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা: এককেন্দ্রিক সরকারে সমস্ত ক্ষমতা এক কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয় বলে এখানে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৩. আমলাদের দৌরাত্ম্য: এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ অত্যধিক হয়। সরকার আমলাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে আমলাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়।

৪. আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা: আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা না থাকায় স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার সমাধান হয় না।

৫. স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ হয় না: এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় পর্যায়ে বা আঞ্চলিক পর্যায়ে রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ অনেকটা সীমিত। ফলে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে জনগণের মধ্যে নেতৃত্বও বিকশিত হয় না।

এককেন্দ্রিক সরকার

এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ

৬. সমস্যা সমাধানে অসুবিধা: কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারের ওপর স্থানীয় অনেক দায়িত্ব হস্তান্তর করে অপেক্ষাকৃত গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন জাতীয় ও জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। কিন্তু এককেন্দ্রিক সরকারে তা সম্ভব নয়।

৭. বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য অনুপযোগী: রাষ্ট্র যদি আয়তনে বিরাট এবং জনসংখ্যায় বিপুল হয়, যদি সে রাষ্ট্র বহু ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষির হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা উপযোগী নয়।

৮. কেন্দ্রের কাজের চাপ বৃদ্ধি: একটিমাত্র কেন্দ্রে সরকারের কাজকর্ম চলতে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়।

৯. বিপ্লবের সম্ভাবনা: এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রদেশগুলোর সরকার কেন্দ্রের এজেন্টমাত্র। এখানে প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসন থাকে না। এর ফলে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন বা বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ০৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

অর্থ ও সংজ্ঞা: ইংরেজি Federation শব্দের বাংলা হলো 'যুক্তরাষ্ট্র'। 'ফেডারেশন' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'ফোয়েডাস' (Foedus) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ 'সন্ধি' বা 'মিলন'। সুতরাং শব্দগত অর্থে, কতিপয় রাষ্ট্রের সন্ধি বা মিলনের ফলে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। যখন কতিপয় স্বাধীন রাষ্ট্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন না থেকে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে একটি সাধারণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠন করে তখন তাকে 'যুক্তরাষ্ট্র' বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সাংবিধানিক প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ওপর সংবিধান ব্যাখ্যা করার চরম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।

অধ্যাপক এইচ. ফাইনারের (Prof. H. Finer) মতে, "যখন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে অর্পিত হয় এবং অন্যান্য অংশ ঐ সমস্ত আঞ্চলিক সংঘের মধ্যকার কেন্দ্রীয় সংস্থায় অর্পিত থাকে, তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে।"

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

অধ্যাপক ডাইসির (Prof. Dicey) মতে, "যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে জাতীয় ঐক্যের সাথে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সমন্বয় সাধনের রাজনৈতিক কৌশল" (A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of states rights.) ।

অধ্যাপক কে. সি হোয়েরের (Prof. K. C. Wheare) মতে, "যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বলতে আমি বুঝি ক্ষমতা বণ্টনের এমন এক পদ্ধতি, যেখানে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার প্রত্যেকেই নিজ নিজ আওতার মধ্যে নির্ভরশীল ও স্বাধীন" (By the federal principle, I mean the method of dividing powers so that the general (central) and regional governments are each within a sphere, co-ordinate and independent.) I

সুতরাং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ স্বার্থে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে স্থানীয় বা প্রাদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করে থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গঠনপদ্ধতি

যুক্তরাষ্ট্র দুইভাবে গঠিত হয়; যথা :

১. ভৌগোলিক দিক থেকে পাশাপাশি অবস্থানরত কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা অথবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় একত্রিত হয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। এই নীতি বা পদ্ধতিকে কেন্দ্রীয়করণ নীতি বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া এভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করেছিল।

২. কোনো বৃহৎ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র সংবিধানের মাধ্যমে জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রের হাতে ও আঞ্চলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রদেশের হাতে অর্পণ করে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি। ভারত, কানাডা, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় এ পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. সংবিধানের প্রাধান্য: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। জাতীয় বা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করে। সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন।

২. যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে দুই ধরনের বিপরীতমুখী প্রবণতা দেখা যায়- একটি হলো কেন্দ্রবিমুখী,

অপরটি কেন্দ্রমুখী। এই ব্যবস্থায় প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলো জাতীয় ঐক্য চাইবে কিন্তু এক হয়ে মিশে যেতে চাইবে না (They must desire union but must not unity)। প্রদেশগুলো কতগুলো সাধারণ বিষয়ে একটা ঐকমত্য সৃষ্টি করে। বাদবাকি ক্ষেত্রে প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে চায়। একে "যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব" (Federal Sentiment) বলে।

৩. দুই ধরনের সরকার: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক এই দু ধরনের সরকার থাকে। প্রত্যেক সরকারই স্ব-স্ব সাধীনতা।

৪. দ্বৈত নাগরিকত্ব: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে নাগরিকগণ প্রথমত নিজ নিজ প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের নাগরিক; দ্বিতীয়ত তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল রাষ্ট্রের নাগরিক।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

৫. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: এ শাসনব্যবস্থায় আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হয়। নিম্নকক্ষ সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব এবং উচ্চকক্ষ সাধারণত প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

৬. লিখিত সংবিধান: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংবিধান লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা সংবিধানে অঙ্গরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা লিখিতভাবে বণ্টন করা থাকলে কেউ কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

৭. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান: যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়ার ফলে এর কোনো ধারা পরিবর্তন করে কেউ ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে না।

৮. সংবিধানের রক্ষক হিসেবে বিচার বিভাগ: সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিচার বিভাগ যে ব্যাখ্যা প্রদান করে সেটাকেই প্রামাণ্য ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা হয়। বিচার বিভাগ হচ্ছে সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক।

৯. ক্ষমতা বণ্টন : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়া হয়। মুদ্রা, বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা প্রভৃতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং বাদবাকি বিষয়গুলো প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের শর্তাবলি

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব (Federal Sentiment): যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব'। যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাবের রয়েছে দুটি দিক-(১) কেন্দ্রমুখী প্রবণতা (Centripetal tendency) এবং (২) কেন্দ্রবিমুখী প্রবণতা (Centrifugal tendency)। ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য ইচ্ছার পাশাপাশি যখন প্রদেশ বা অঞ্চলগুলোর মধ্যে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বাসনাও প্রবল থাকে তখন 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব' সৃষ্টি হয়।

২. ভৌগোলিক সান্নিধ্য: ভৌগোলিক সান্নিধ্যের ফলে জনগণের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছা দেখা দেয়। অপরদিকে ভৌগোলিক অসংলগ্নতা ঐক্যবদ্ধ হবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা-পূর্ব কালে বর্তমান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি অঙ্গরাজ্য পাশাপাশি অবস্থিত থাকায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা অর্জন এবং একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। ধর্মের বন্ধন থাকা সত্ত্বেও ভৌগোলিক অসংলগ্নতার কারণে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে যায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ স্বাধীন হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের শর্তাবলি

৩. ধর্মীয় ঐক্য: যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের জনগণ একই ধর্মাবলম্বী হলে ভালো হয়। তবে শুধু ধর্মের বন্ধনই যথেষ্ট নয়। কেননা ধর্মের বন্ধনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলেও ভাষা এবং সংস্কৃতিগত বন্ধন না থাকায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়ায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তান নামক যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটে।

৪. ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য: যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর জনগণের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য থাকা

প্রয়োজন। যখন বিভিন্ন প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের জনগণ একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাদেরকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যভাব গড়ে ওঠে। ভাষা ও সংস্কৃতিগত বিভিন্নতার কারণেই পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে যায় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

৫. রাজনৈতিক সচেতনতা: যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা জটিল শাসনব্যবস্থা। এর সফলতার জন্য তাই জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সজাগতা এবং আত্মত্যাগের মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের শর্তাবলি

৬. সৎ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব: সৎ, দেশপ্রেমিক ও সুযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সফল হয় না। জর্জ ওয়াশিংটন, ম্যাডিসন, হ্যামিল্টন, জেফারসন ও লিঙ্কনের মত সুযোগ্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতারা পৃথিবীর বুকে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা এবং তা সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৭. সাংবিধানিক প্রাধান্য: সাংবিধানিক প্রাধান্য না থাকলে যুক্তরাষ্ট্র সফল হতে পারে না। কেননা যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই হচ্ছে জনগণের রক্ষক ও অভিভাবক।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপ :

১. জাতীয় ঐক্যের সাথে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয়: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমন্বয়ে বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনে প্রেরণা যোগায়। প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও বৃহৎ রাষ্ট্রের মান-মর্যাদা ভোগ এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে।

২. বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী: বৃহৎ ও বৈচিত্র্যের অধিকারী রাষ্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার খুবই কার্যকর ও উপযোগী। কেননা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দুই বিপরীতমুখী প্রবণতাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত। একদিকে প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি একটি রাষ্ট্রে যুক্ত হতে চায় কিন্তু অন্যদিকে আঞ্চলিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে চায়।

৩. স্বৈরশাসন প্রতিরোধ: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানের মাধ্যমে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না।

৪. কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ হ্রাস: স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিষয় সংক্রান্ত কাজ অঙ্গরাজ্যের ওপর ন্যস্ত হলে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বাড়তি কাজের চাপমুক্ত থাকতে পারে।

৫. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসার: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসার ঘটে। এর ফলে প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অভিজ্ঞতারও ব্যাপ্তি ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ

৬. রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। কেননা এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণকে একদিকে যেমন নিজ অঙ্গরাজ্যের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নাগরিক হিসেবে জাতীয় অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে একইভাবে সচেতন থাকতে হয়।

৭. ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন: পাশাপাশি অবস্থানরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু রাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হবার জন্য এবং দ্রুত উন্নতি লাভের আশায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। এর ফলে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে শক্তিশালী ও বৃহৎ রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং বহির্বিশ্বে শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পারে।

৮. জাতীয় সংহতি ও স্থিতিশীলতা অর্জন: যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব বিদ্যমান থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সরকার ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৯. কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা কম: যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়া হয় সংবিধানের মাধ্যমে। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা তিরোহিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ:

১. ব্যয়বহুল সরকার ব্যবস্থা: এই সরকার ব্যয়বহুল। দ্বৈত সরকারের কাঠামো তৈরি ও বজায় রাখতে গিয়ে অনেক বাহুল্য খরচের সম্মুখীন হতে হয়।

২. শাসনতান্ত্রিক জটিলতা: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে। অঙ্গরাজ্যগুলো নিজ নিজ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে এক অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী অন্য অঙ্গরাজ্যে গিয়ে বিপরীতমুখী আইনের সম্মুখীন হয়ে বিব্রত অবস্থায় পড়তে পারেন।

৩. সরকার দুর্বল হয়: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অনেক সময় দুর্বল সরকারে পরিণত হয়। কেননা প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় বলে বলিষ্ঠ ও দ্রুত শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব: সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে জনকল্যাণ বিঘ্নিত হয় ও রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

৫. বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা: শাসনতান্ত্রিক বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য অথবা অঙ্গরাজ্যসমূহের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে ভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন ও তা কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষ

৬. নাগরিকদের ঔদাসীন্য বৃদ্ধি করে: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের জটিলতার জন্য অনেকে এই শাসনব্যবস্থার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। জনগণের উদাসীনতা আস্তে আস্তে রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

৭. জটিল পদ্ধতি: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি জটিল। জনগণ শিক্ষিত ও রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন না হলে এবং তাদের মধ্যে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব' শক্তিশালী না হলে এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে পারে।

৮. অনমনীয়তা: যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় ও অনমনীয়। এরূপ সংবিধান পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে অনেক সময় ব্যর্থ হয়। এর ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

৯. জরুরি অবস্থার জন্য অনুপযোগী: জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা অনেক সময় প্রকৃতিগত জটিলতার কারণে ব্যর্থ হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের তুলনা

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা একটি অন্যটির বিপরীত রূপ। উভয় সরকার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়:

১. ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব : এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় আইনসভা দেশের একমাত্র সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হয় না। সেখানে একাধিক প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের অস্তিত্ব থাকে এবং সে সমস্ত সরকারসমূহ সাংবিধানিকভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারসমূহ নিজ নিজ এখতিয়ার অনুযায়ী নিজস্ব আইনসভা দ্বারা আইন প্রণয়ন করে থাকে।

২. সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতাবণ্টন: এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় দেশের সংবিধান আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে না। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছামত ঐ সমস্ত আঞ্চলিক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে আবার কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারকে অর্পিত ক্ষমতা কোনো কারণ ব্যতিরেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারে। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে সংবিধান ক্ষমতা বণ্টন করে দেয় যা কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করে নিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার সমমর্যাদার ভিত্তিতে নিজ নিজ ক্ষমতা চর্চা করে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের তুলনা

৩. স্থানীয় সরকার: এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রশাসনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানীয় সরকার গঠন করে থাকে। তবে এসব স্থানীয় সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এবং তার এজেন্টরূপে কাজ করে থাকে। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকারসমূহ সংবিধান দ্বারা গঠিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় এবং স্বাধীনভাবে ক্ষমতার চর্চা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে ঐ সমস্ত স্থানীয় সরকারসমূহ ভেঙে দিতে পারে না।

৪. সংবিধানের প্রকৃতি: এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় দেশের সংবিধান লিখিত অথবা অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় অথবা দুষ্পরিবর্তনীয় যে কোনো ধরনের হতে পারে। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় দেশের সংবিধান অবশ্যই লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়।

৫. আনুগত্য : এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় দেশের নাগরিককে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে হয়। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশের নাগরিককে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের তুলনা

৬. বিচার বিভাগের ভূমিকা: এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বই বহাল থাকে। কেননা কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় দেশের বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সাংবিধানিকভাবে সে বিরোধের মীমাংসা বিচার বিভাগ করে থাকে। এমনকি দেশের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা প্রশাসনিক নির্দেশ সংবিধানের বিধান মতে বৈধ কি-না তাও দেশের বিচার বিভাগ পর্যালোচনা করে থাকে।

৭. কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের প্রকৃতি: এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রে একটিমাত্র সরকার থাকে। প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট মাত্র। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর নিজস্ সরকার থাকে।

৮. সংবিধানের প্রকৃতি: এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান লিখিতও হতে পারে অলিখিতও হতে পারে, সুপরিবর্তনীয়ও হতে পারে দুষ্পরিবর্তনীয়ও হতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হতে বাধ্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের তুলনা

৯. নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে : এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় একক নাগরিকত্ব বিদ্যমান। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈত নাগরিকত্ব বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রে একই ব্যক্তি একাধারে তার নিজ প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রের নাগরিক আবার সে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক।

১০. রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ: এককেন্দ্রিক সরকার ব্যয়বহুল নয়। কেননা একটিমাত্র সরকার থাকার ফলেই ব্যয়ও হয়. কম। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের পিছনে অনেক ব্যয় হয়। এজন্যই যুক্তরাষ্ট্র ব্যয়বহুল হয়।

১১. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন: এককেন্দ্রিক সরকারে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর স্বায়ত্তশাসন সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ০৭ রাজতান্ত্রিক সরকার

রাজতান্ত্রিক সরকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রাজতান্ত্রিক সরকার

রাজতন্ত্র হচ্ছে সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে রাজা বা রানির হাতে রাষ্ট্রের চরম ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে এবং রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন। অতীতে অধিকাংশ দেশেই রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজার ইচ্ছাই ছিল চূড়ান্ত। মন্ত্রিগণ ছিলেন রাজার একান্ত অনুগত। এরূপ রাজতন্ত্রকে বলা হয় চরম বা অসীম রাজতন্ত্র (Absolute or unlimited Monarchy)। অতীতে এরূপ রাজতন্ত্রে রাজাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বর্তমান সময়েও সৌদি আরবসহ কিছু কিছু দেশে এরূপ রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে আর এক ধরনের রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। এরূপ রাজতন্ত্রকে বলা হয় 'সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র' (Limited or Constitutional Monarchy)। গ্রেট ব্রিটেনে সর্বপ্রথম এরূপ সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেন ছাড়াও জাপান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে এরূপ রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু সরকার পরিচালনা করেন জনগণের নির্বাচিত সরকার। নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যগণের আস্থাভাজন নেতাই সরকার গঠন করে থাকেন। অধিকাংশ সসীম রাজতান্ত্রিক দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাজা বা রানি হলেন নামমাত্র শাসক এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক তথা সরকারপ্রধান।

রাজতান্ত্রিক সরকার

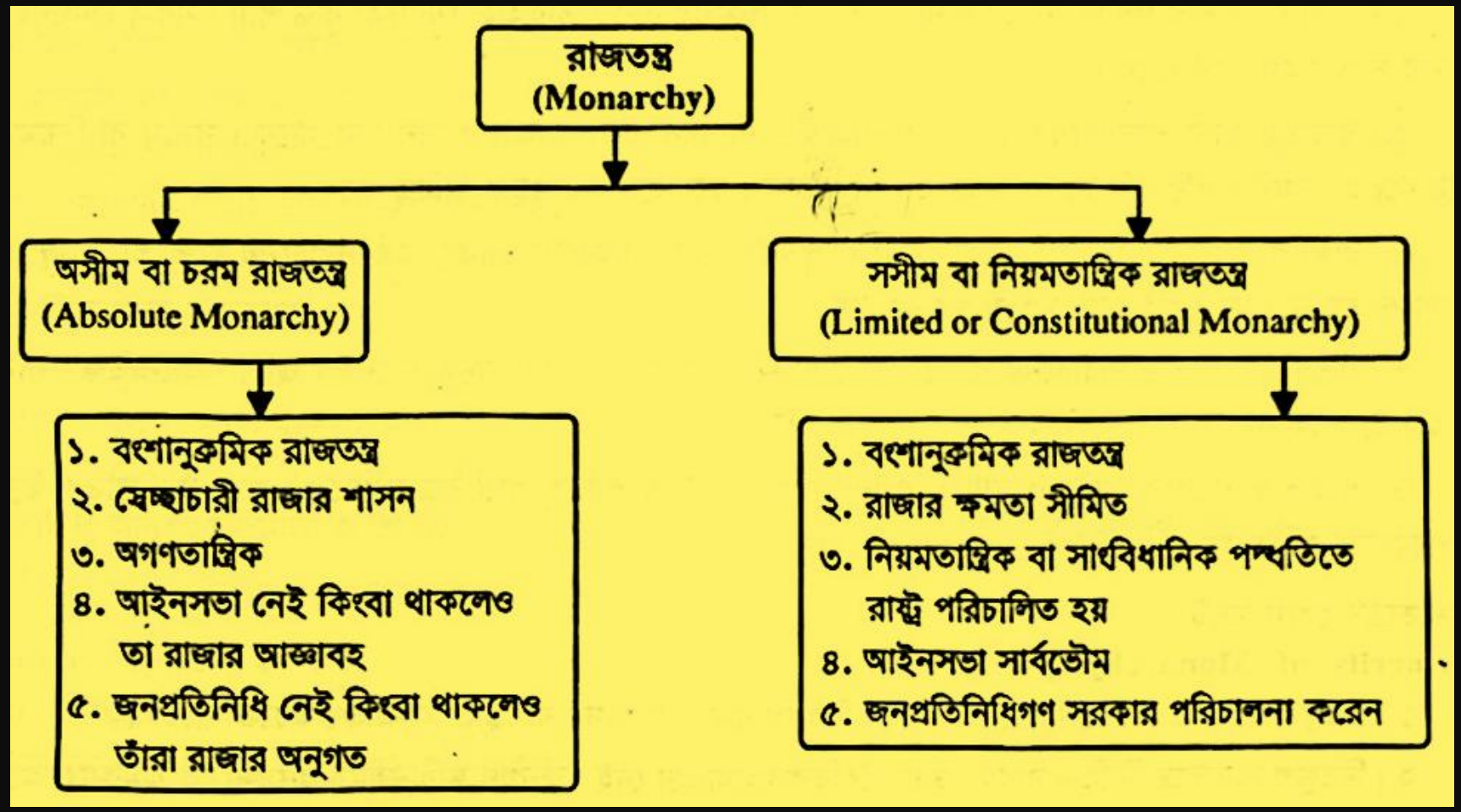

রাজতান্ত্রিক সরকার

রাজতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য-Characteristics of Monarchy

রাজতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১। রাজা বা রানি বংশানুক্রমে বা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। অবশ্য মালয়েশিয়ার রাজা নির্বাচিত হন।

২। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি হচ্ছেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান। কিন্তু সীমিত বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি নামমাত্র শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান। প্রকৃত ক্ষমতা চর্চা করেন প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ সরকারপ্রধান।

৩। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে রাজা বা রানির হাতেই আইন প্রণয়ন, শাসন কাজ পরিচালনা এবং বিচারের চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। ফলে এখানে ক্ষমতার পৃথকীকরণ ঘটে না। অপরদিকে সীমিত রাজতন্ত্রে ক্ষমতার পৃথকীকরণ লক্ষ করা যায়।

৪। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে শাসন বিভাগের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তবে গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে সীমিত রাজতন্ত্র এবং সংসদীয় গণতন্ত্র থাকায় আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

রাজতান্ত্রিক সরকার

৫। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে কোনো রাজনৈতিক দল থাকে না, এমনকি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ থাকে। তবে সসীম রাজতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।

৬। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা নেই। আইন প্রণেতা, মন্ত্রী বা সভাসদ প্রভৃতি সকলেই রাজা বা রানি কর্তৃক মনোনীত হন। কিন্তু সীমিত রাজতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা করে থাকে।

৭। রাজতন্ত্রে রাজা বা রানিই হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান; সবকিছুর মূল নিয়ন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ব্যক্তি। অবশ্য সীমিত রাজতন্ত্রের রাজা বা রানি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সবকিছু করে থাকেন। রাজা বা রানি রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক।

রাজতান্ত্রিক সরকার

রাজতন্ত্রের গুণাবলি-Merits of Monarchy

১। রাজা বা রানি রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে থাকেন। ফলে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

২। রাজা বা রানি রাজনীতি নিরপেক্ষ ব্যক্তি হওয়ায় সকলের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সকল জনগণই তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে থাকে।

৩। রাজতন্ত্র স্থায়ী শাসনব্যবস্থা। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে দীর্ঘদিন একই রাজার শাসন চালু থাকে। সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন হলেও রাজা বা রানি থাকেন। ফলে শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব থাকে।

৪। রাজা বা রানি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ক্ষমতা লাভ করেন উত্তরাধিকারসূত্রে। এক্ষেত্রে নির্বাচনের মতো ব্যয়বহুল পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। ফলে রাজতন্ত্রে অপচয় খুব কম হয়।

৫। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে নির্বাচনের ব্যবস্থা নেই, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও অনুমতি নেই। ফলে রাজনৈতিক দলাদলি ও সহিংসতা থাকে না।

৬। রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান পদের স্থায়িত্ব ও নিরপেক্ষতা থাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি ও মানবকল্যাণ সূচিত হয়।

রাজতান্ত্রিক সরকার

রাজতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি-Demerits of Monarchy

১। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র গণতন্ত্র বিরোধী। জনগণ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

২। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলব্যবস্থা নেই। জনগণ স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

৩। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। জনগণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে না।

৪। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে আইনের শাসন নেই, সাম্যনীতি নেই। ফলে ন্যায়বিচার পদদলিত হয়।

৫। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের রাজা এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বশংবদ সভাসদ বা অমাত্যরাই দেশ শাসন করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শাসন কাজের সকল ধরনের অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে।

৬। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র স্বায়ত্তশাসনকে অস্বীকার করে।

৭। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রকৃত অর্থেই স্বেচ্ছাচারী শাসন।

৮। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি ঘটে না বরং ব্যক্তিসত্তার অপমৃত্যু ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ০৮ সমাজতান্ত্রিক সরকার

সমাজতান্ত্রিক সরকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজতান্ত্রিক সরকার

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তথা পুঁজিবাদের বিপরীতধর্মী ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপাদানগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রবাদ উৎপাদনের যৌথ মালিকানা এবং উৎপাদিত সামগ্রীর প্রয়োজনভিত্তিক বণ্টনের নীতিতে বিশ্বাসী। উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টনের দ্বারা শ্রেণিবৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সমাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সমাজতন্ত্র মতবাদের উপর ভিত্তি করে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে পূর্ব ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে চীন, উত্তর কোরিয়া, কিউবা, উত্তর ভিয়েতনাম প্রভৃতি রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক সরকার

সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

Origin and Development of Socialism

'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ও 'মোজেজ' কর্তৃক প্রণীত অনুশাসনের মধ্যে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ১৫১৬ সালে প্রকাশিত টমাস্ ম্যুর লিখিত 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা চিন্তারাজ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফরাসি বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক নেতা বেবউফ সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য বৈপ্লবিক পন্থায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে গিয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। উনবিংশ শতাব্দীতে 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী' বলে পরিচিত ফরাসি দার্শনিক সেন্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়ের ও ইংরেজ দার্শনিক রবার্ট ওয়েন সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের মতে, অবাধ নীতিই (Doctrine of Laissez-faire) সমাজের সর্বপ্রকার অসাম্যের মূল কারণ।

সমাজতন্ত্রের যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেন জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর ব্রিটিশ সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্। কার্ল মার্কসই প্রথম চিন্তাবিদ যিনি সমাজতন্ত্রকে জড়বাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে সমাজতন্ত্রকে 'কল্পনার রাজ্য' থেকে মুক্ত করে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সুনিশ্চিত পদ্ধতির রূপরেখা প্রণয়ন করেন। কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সামনে রেখে ১৯১৭ সালে বিপ্লবের মাধ্যমে লেনিন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

সমাজতান্ত্রিক সরকার

সমাজতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য

Features of Socialist Government

সমাজতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা: সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণই সকল সম্পদের মালিক। শিল্প-কল কারখানা ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকার তা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে।

২. সমষ্টির স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব প্রদান: সমাজতান্ত্রিক সরকার পরিচালিত হয় সমষ্টির স্বার্থে। ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে এখানে সমষ্টির স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

৩. সামাজিক কল্যাণ: সমাজতান্ত্রিক সরকারের লক্ষ্য হলো সামাজিক কল্যাণ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সরকার শ্রমিকদের মজুরির নিশ্চয়তা বিধান করে, তাদের সুযোগ-সুবিধা ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে দেয়।

সমাজতান্ত্রিক সরকার

৪. সম্পদের সুষম বণ্টন: সমাজতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ সকল মানুষের মধ্যে সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৫. সর্বহারার একনায়কত্ব: সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে 'সর্বহারার একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়।

৬. একদলীয় ব্যবস্থা: সমাজতান্ত্রিক সরকার একদলীয় ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে। এখানে একটিমাত্র দল থাকে। সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা যায় না।

৭. পরিকল্পিত অর্থনীতি: সমাজতান্ত্রিক সরকার পরিকল্পিত অর্থনীতি কার্যকর করে থাকে। কোন্ দ্রব্য কতটুকু উৎপাদিত হবে তা রাষ্ট্রীয় কতৃপক্ষই নির্ধারণ করে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সরকার

সমাজতান্ত্রিক সরকারের গুণাবলি/Merits of Socialist Government

সমাজতান্ত্রিক সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপ:

১। সম্পদের সুষম বণ্টন: সমাজ কোনো ব্যক্তিবিশেষের দান নয়। সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রের সম্পদ শুধু গুটিকয়েক ব্যক্তির স্বার্থে যাবে এটা সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন না। সমাজতান্ত্রিক সরকার সম্পদের সুষম বণ্টনে বিশ্বাস করে।

২। শ্রমিকদের মজুরির নিশ্চয়তা বিধান: সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় শ্রমিক-শোষণ বন্ধ ও উৎপাদনের অপচয় রোধ করার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত শিল্প, কল-কারখানা ইত্যাদি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কারণ ব্যক্তিমালিকানায় শ্রমিক শোষণ ও শ্রেণিবৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়।

৩। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা: সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্র হচ্ছে ধনী বা শাসকশ্রেণির শোষণের হাতিয়ার। তাই শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা অপরিহার্য।

৪। সুযোগ-সুবিধা ভোগের নিশ্চয়তা: সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জনগণ অধিক মাত্রায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। রাষ্ট্রের পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, বিশ্রাম, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধাগুলো নিশ্চিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক সরকার

৫। অপচয় রোধ: সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে বলে অপচয় ঘটে না।

৬। সাম্যের যুক্তি: প্রকৃতিগতভাবে সকল মানুষ সমান। আলো-বাতাস যেমন সকলেই সমানভাবে ভোগ করতে পারে, তেমনি সকল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরও মানুষের সমান অধিকার থাকা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র এই সাম্যের যুক্তিতেই সকল সম্পদের উপর সকলের অধিকার বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রবর্তন করতে চায়।

৭। গণতন্ত্রের যুক্তি: সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলে। সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য অর্থহীন। অধ্যাপক লাস্কি গণতন্ত্রের সফলতার জন্য আর্থিক বৈষম্য দূর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবসন বলেন, "গণতন্ত্র বলতে ন্যূনতম মৌলিক আর্থিক কল্যাণকে বোঝায়; কারণ অভুক্ত, গৃহহীন, রোগাক্রান্ত ও বস্ত্রহীনদের নিকট রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন।"

৮। সাম্য ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি: সমাজতান্ত্রিক সরকার শ্রেণিহীন সরকার প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ। ফলে শ্রেণিশোষণ লোপ পায় এবং সাম্য ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে।

৯। কর্মসংস্থান : সমাজতান্ত্রিক সরকার বেকারত্ব দূরীকরণে সফল হয়। কেননা উৎপাদন ও বণ্টনের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সরকার

সমাজতান্ত্রিক সরকারের দোষাবলি/Demerits of Socialist Government

সমাজতান্ত্রিক সরকারের দোষসমূহ নিম্নরূপ :

১। গণতন্ত্রের পরিপন্থী: সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

২। ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই : সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না। ফলে ব্যক্তি তার কর্ম প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সকল উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং পরিশ্রমবিমুখ হয়ে পড়ে, যা একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অকল্যাণকর।

৩। উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নীত হয় না: এ সরকার ব্যবস্থায় সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অবাধ ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা না থাকায় দ্রব্যের মান উন্নত হয় না।

৪। মূল্য হ্রাস পায় না: অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকার ফলে মূল্য হ্রাস পায় না। এর ফলে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

৫। উৎপাদন ব্যাহত হয়: অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৬। ব্যক্তিগত সম্পদ ক্রয়, সঞ্চয় ও পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ নেই: রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা কতটুকু সফল হবে তা সঠিক করে বলা যায় না। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ ক্রয়, সঞ্চয় ও পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ থাকে না।

সমাজতান্ত্রিক সরকার

৭। রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী: ব্যক্তি তার নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে না, বরং রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।
৮। রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হয়: অসীম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পেয়ে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হয়ে যায় এবং জনগণের স্বাধীনতার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়।
৯। মানুষের জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা: সমাজতান্ত্রিক সরকার মানুষের জীবনকে গতানুগতিক ছকের মধ্যে ফেলে তার জীবনের বৈচিত্র্য ও স্বকীয় সত্তাকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়।
উপসংহার: সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার বিপক্ষে উপরোক্ত সমালোচনা থাকলেও বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্রবাদ এখনোও একটি শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। বিশ্বের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এখনও এ মতাদর্শে বিশ্বাসী। শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না, তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক মুক্তি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থে সাম্যবাদী অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। বিশ্বের বহু দেশ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এমনকি বহু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও বর্তমানে জনকল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণ করছে এবং উৎপাদন ও বণ্টনে আংশিক হস্তক্ষেপ করছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ০৯ সামরিক সরকার

সামরিক সরকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামরিক সরকার

একটি দেশের নির্বাচিত সরকারের শাসন ক্ষমতা যখন সে দেশের সামরিক বাহিনী দখল বা করায়ত্ত করে নেয় এবং সরকার পরিচালনা করতে শুরু করে তখন তাকে সামরিক সরকার বলে। বর্তমান শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সদ্য স্বাধীন অনেক দেশে বেসামরিক সরকারের দুর্নীতি, অব্যবস্থা, দলীয় কোন্দল বা রাজনৈতিক হিংসা-বিদ্বেষ, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ইত্যাদির ফলে জনগণ যখন ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ে তখনই সামরিক বাহিনী বা এই বাহিনীর কোনো উচ্চাভিলাষী সেনা কর্মকর্তা ক্যু করে ক্ষমতা দখল করে। শাসন ক্ষমতা দখল করেই সেনা শাসকরা সংবিধান, সরকার, আইনসভা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত ঘোষণা করে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বাংলাদেশের আলোকে বলা যায়, সামরিক শাসক একটি 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোটের মাধ্যমে তার প্রতি আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এরূপ নির্বাচন মূলত একটি প্রহসন ও ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন দল থেকে ক্ষমতালোভী নেতাদেরকে ভাগিয়ে এনে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া। সময় অনুকূলে এলে প্রধান সামরিক প্রশাসক (Chief Martial Law Administrator = CMLA) সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করে উপরোক্ত রাজনৈতিক দলের প্রধান হন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সামরিক শাসকগণ নির্বাচনে পরাজিত হন এমন নজির নেই বললেই চলে।

সামরিক সরকার

সামরিক সরকারের কর্তৃত্বের প্রকৃতি ও তা ব্যবহারের ভিত্তিতে একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ১। কর্তৃত্ববাদী সামরিক সরকার এবং ২। সর্বাত্মকবাদী সামরিক সরকা। কর্তৃত্ববাদী সামরিক সরকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামরিক শাসক সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করলেও ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যত হয় না। অপরদিকে যখন সামরিক সরকার রাষ্ট্রীয় জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি ব্যক্তিজীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয় তখন তাকে
সর্বাত্মকবাদী সামরিক সরকার (Totalitarian Military Government) বলে।

সামরিক সরকার

সামরিক সরকারের গুণাবলি/Merits of Military Government

সামরিক সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপ:

১। যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য উপযোগী: অনেকেই যুক্তি দেখান যে, সামরিক সরকার যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য উপযোগী। কেননা সামরিক শাসক নিজেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম।

২। দুর্নীতি দূরীকরণে প্রাথমিক সাফল্য: দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের জন্য সামরিক শাসন প্রাথমিকভাবে সুফল বয়ে আনে।

৩। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সামরিক সরকার দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়। জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় এ সরকার উপযোগী।

৪। ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে: রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব যদি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে সে সময়ে সামরিক শাসন সুফল বয়ে আনতে পারে।

৫। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: সামরিক সরকার দীর্ঘদিন নির্বাচন না দিয়েই শাসন করেন। নির্বাচন দিলেও নিজেরাই - কৌশলে দল গঠন করে ক্ষমতাসীন হন। ফলে একধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা: সামরিক সরকার সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে দ্রুত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম হয়।

সামরিক সরকার

সামরিক সরকারের দোষসমূহ/Demerits of Military Government

সামরিক সরকারের দোষগুলো নিম্নরূপ:

১। অস্বাভাবিকতা: সামরিক সরকার অস্বাভাবিক সরকার ব্যবস্থা।

২। অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী: সামরিক সরকারব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা।

৩। কর্তৃত্ববাদী অথবা সর্বাত্মকবাদী: সামরিক সরকার হয় কর্তৃত্ববাদী একনায়কতান্ত্রিক শাসক নয়তো সর্বাত্মকবাদী শাসক।

৪। একনায়কতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি: সামরিক সরকারের মধ্যে একনায়কতান্ত্রিক সরকারের সকল দোষই লক্ষ করা যায়।

৫। ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাব: সামরিক সরকার ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পদদলিত করা হয়। এর ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না।

৬। গোষ্ঠীতন্ত্র : সামরিক শাসকগণ রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতাই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা চক্রের হাতে কুক্ষিগত করে রাখে।

সামরিক সরকার

৭। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশে বাধা প্রদান: সামরিক সরকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।

৮। সাংগঠনিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত: সামরিক সরকার রাজনৈতিক দলব্যবস্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে রাজনৈতিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাংগঠনিক অগ্রযাত্রা, উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৯। জোরের যুক্তিতে বিশ্বাস: সামরিক সরকার জোরের যুক্তিতে বিশ্বাসী, যুক্তির জোরে বিশ্বাসী নয়।

১০। নেতৃত্বের সংকট: রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকার ফলে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিকাশের সুযোগ না থাকায় ভবিষ্যতে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ১০ ধর্মতান্ত্রিক সরকার

ধর্মতান্ত্রিক সরকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ধর্মতান্ত্রিক সরকার

ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী যখন কোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তখন তাকে 'ধর্মতান্ত্রিক সরকার' বলে। অনেক সময় ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত সরকারকেও ধর্মতান্ত্রিক সরকার বলা হয়।

মধ্যযুগে ছিল ধর্মের জয়জয়কার। ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকেই তখন রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হতো। খ্রিস্টান জগতে চার্চ শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানই পরিচালনা করতো না, রাষ্ট্রীয় বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতো। আধুনিক যুগে শিল্প বিপ্লব, রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ, জাতীয় রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব এবং সবশেষে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে থাকলে ধর্মীয় রাষ্ট্র এবং ধর্মতান্ত্রিক সরকারেরও প্রভাব কমতে থাকে। ভ্যাটিকান সিটিতে ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। অতি সম্প্রতি ইরানে ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক দেশে মৌলবাদী ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা প্রসারিত হচ্ছে। চলমান রাজনীতির ব্যর্থতাই ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আবেদনকে অনেক দেশে জোরালো করে তুলছে।

ধর্মতান্ত্রিক সরকার

ধর্মতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. ধর্মীয় বিধি-বিধান: ধর্মতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতার উৎস ধর্মীয় বিধি-বিধান। ধর্মতান্ত্রিক সরকার ধর্মীয় গ্রন্থকে সংবিধানের মর্যাদা প্রদান করে। সরকার পরিচালিত হয় ধর্মীয় বিধি-বিধানের আলোকে।

২. সার্বভৌম ক্ষমতা: ধর্মতান্ত্রিক সরকার বিধাতার সার্বভৌমে বিশ্বাস করে। তাদের মতে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়।

৩. বিধাতার প্রতিনিধি : ধর্মতান্ত্রিক সরকারে বিশ্বাস করা হয় যে, ধর্মীয় নেতাগণই হলেন মর্তলোকে বিধাতার প্রতিনিধি। কাজেই তাদের নেতৃত্ব ও শাসনকে মেনে চলতে হবে।

৪. ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল: ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলই রাজনীতি করতে পারে।

৫. একদলীয় ব্যবস্থা : ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে সাধারণত ক্ষমতাসীন ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বাধীন দলই রাজনীতি করার অধিকার লাভ করে। অন্যান্য দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

৬. রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস: ধর্মীয় আইন ও অনুশাসন এবং ক্ষমতাসীন ধর্মীয় নেতাদের আদেশ-নির্দেশই রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড: রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা, ব্যাংক-বিমা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধর্মীয় বিধি-বিধান মোতাবেক পরিচালিত হয়।

ধর্মতান্ত্রিক সরকার

ধর্মতান্ত্রিক সরকারের গুণাবলি

ধর্মতান্ত্রিক সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপ :

১. ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা: ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একই ধর্মীয় ভাবাদর্শ দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং একই ধর্মীয় বিধি-বিধান দ্বারা রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে একধরনের ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠে বলে ধর্মীয় নেতাগণ বিশ্বাস করেন।

২. অবিচার-অনাচার দূরীকরণ: কঠোরভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ফলে অবিচার-অনাচার দূরীভূত হবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

৩. সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা: ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর হবে, অনাচার-অবিচার দূর হবে, শোষণ-বঞ্চনা দূর হবে, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি দূর হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। এর ফলে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

৪. ভ্রাতৃত্ববোধ : ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হয়।

৫. শান্তি-শৃঙ্খলা : ধর্মতান্ত্রিক সরকার খুব দ্রুত শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় বা হতে পারে। কেননা শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এছাড়াও মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও নৈতিক চেতনা সমুন্নত হবার ফলেও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

ধর্মতান্ত্রিক সরকার

ধর্মতান্ত্রিক সরকারের দোষসমূহ

ধর্মতান্ত্রিক সরকারের দোষগুলো নিম্নরূপ:

১. এক দলীয় ব্যবস্থা: ধর্মতান্ত্রিক সরকার মূলত একদলীয় সরকার। বিরোধী মত ও অনুসারী দলগুলোর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না।

২. স্বৈরাচারী হয়: ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না। এরূপ অবস্থায় সরকার স্বৈরাচারী হয়।

৩. সর্বাত্মকবাদী সরকার: ধর্মতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তিজীবনের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যত হয়। ফলে এরূপ সরকার সর্বাত্মকবাদী হতে পারে।

৪. দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার অভাব: ধর্মতান্ত্রিক সরকারে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নেই। ফলে এরূপ সরকার স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয় বা হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

ধর্মতান্ত্রিক সরকার

৫. প্রগতি ও মুক্ত চিন্তার বিরোধী: ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রগতি ও মুক্ত, স্বাধীন চিন্তা-চেতনাকে সহ্য করতে পারে না।

৬. রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার: ধর্মতান্ত্রিক সরকারে ক্ষমতাসীন ধর্মীয় নেতাগণ রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার করতে পারেন। ধর্ম, নৈতিকতা ও রাজনীতিকে একইসূত্রে গ্রথিত করার অপচেষ্টা চলতে পারে।

৭. মানবিক আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা: ধর্মতান্ত্রিক সরকার মানবিক আইনে বিশ্বাসী নয়। তারা প্রচার করে যে, মানবিক আইন মানুষের মনগড়া আইন। মানবিক আইন অভ্রান্ত নয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ১১ উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

কোন্ ধরনের সরকার উত্তম তা বলার উপায় নেই। কেননা একটি দেশে সরকার ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তা সেদেশের প্রচলিত অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাগত মান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও সংস্কৃতি, রীতিনীতি ইত্যাদি সবকিছুই একটি দেশের সরকারের মান ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এজন্যই এক দেশে যে সরকার উত্তম বলে বিবেচিত হয়, অন্যদেশে তা না-ও হতে পারে।

উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

উত্তম সরকারের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১। গণতান্ত্রিক: উত্তম সরকার হবে গণতান্ত্রিক। সরকার গঠিত হবে নির্বাচনের মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় সব কাজই জনপ্রতিনিধিগণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

২। দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক: উত্তম সরকার অবশ্যই দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক হবে। সরকারের প্রতিটি কাজ বা উদ্যোগ সংসদে সমর্থিত বা অনুমোদিত হতে হবে। সরকার জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের নিকট সবকিছুর জন্য দায়ী থাকবেন।

৩। আইনসভার সার্বভৌমত্ব: উত্তম সরকারের আইনসভা হবে সার্বভৌম। আইনসভার অনুমোদন ভিন্ন শাসন বিভাগ কোনো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে না। আইনসভা অনাস্থা আনলে সরকার পদত্যাগ করবে।

৪। আইনের অনুশাসন: উত্তম সরকার যথার্থ আইনের অনুশাসন গড়ে তুলবে। আইনের চোখে সকলেই হবে সমান। কাউকে বেআইনি আটক বা হয়রানি করা থেকে সরকার বিরত থাকবে।

৫। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ: উত্তম সরকার ব্যবস্থায় শাসন, আইন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ঘটবে। বিশেষ করে শাসন বিভাগ অন্য বিভাগ দুটির উপর অযথা হস্তক্ষেপ করবে না।

উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

৬। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত না করে তার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হবে।

৭। জনগণের আস্থা অর্জন: উত্তম সরকারকে তার কাজ-কর্মের দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৮। সরকারি কর্মচারীদের জনহিতকর মানসিকতা: উত্তম সরকার আমলাদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। আমলা বা সরকারি কর্মচারীরা হবেন জনগণের সেবক, প্রভু নন। সরকারি কর্মচারীদের জনহিতকর মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

৯। মুক্ত ও স্বাধীন প্রচার মাধ্যম: উত্তম সরকার অবশ্যই ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। একটি দেশে মুক্ত ও স্বাধীন প্রচার মাধ্যম থাকলে বুঝতে হবে সে সরকার উত্তম।

১০.। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য: উত্তম সরকার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

১১। সহনশীল: উত্তম সরকার সব ধরনের মত ও আদর্শের প্রতি উদার ও সহনশীল হবে। সকলেরই বাকস্বাধীনতা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা থাকবে।

উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে উত্তম সরকারের পথে অন্তরায়

বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন একটি দেশ। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন এবং দীর্ঘ দশ মাসের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এখনো দেশটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। এদেশে উত্তম সরকারের পথে অন্তরায়গুলো নিম্নরূপ:

১। সুষ্ঠু গণতন্ত্র গড়ে ওঠেনি বাংলাদেশে বারবার সামরিক হস্তক্ষেপ, রাজনীতিবিদদের অসাধু চরিত্র, রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্য, জনগণের রাজনৈতিক অসচেতনতা এদেশে গণতন্ত্রের বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। দায়িত্বশীলতার অভাব: বাংলাদেশে আজও সরকার এবং প্রশাসন দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি।

৩। আইনের অনুশাসনের অভাব: বাংলাদেশে বলতে গেলে কোনো সময়ই আইনের অনুশাসন ছিল না। বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন সময় হয়রানিমূলক কালা-কানুন রচনা ও তা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

৪। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয়নি: সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এখনো ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়নি। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা হয়নি।

উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে উত্তম সরকারের পথে অন্তরায়

৫। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: বাংলাদেশে এখনো ক্ষমতার যথাযথ বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি। এখনো সবকিছুই ঢাকামুখী বা ঢাকাকেন্দ্রিক রয়ে গেছে।

৬। জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থতা: বাংলাদেশে বলতে গেলে কোনো সরকারই তার কাজ-কর্ম দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। ক্ষমতায় এসে কোনো সরকারই নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করেনি।

৭। আমলাদের দৌরাত্ম্য: বাংলাদেশে আমলাদের দৌরাত্ম্য সেই ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসনামলের মতোই রয়ে গেছে। এদেশের আমলারা নিজেদেরকে জনগণের প্রভু ভাবেন। শুধু সাধারণ জনগণ নয়, রাজনীতিবিদরাও এদের হাতের ক্রীড়নক।

৮। প্রচার যন্ত্রের উপর অহেতুক সরকারি হস্তক্ষেপ: বাংলাদেশে প্রচারযন্ত্র বা প্রচার মাধ্যম কোনো কালেই স্বাধীন ছিল না। অতীতে সব সরকারই এগুলোর ওপর নিজেদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নিজেদের কীর্তিকলাপের প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছে।

৯। সহনশীলতার অভাব: বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন প্রায় সব সরকার, রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা সহনশীলতার ছিটেফোঁটাও নেই।

উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশে উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

১। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন বজায় রাখতে হবে। গণতন্ত্র কীভাবে সফল হতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২। দায়িত্বশীল সরকার: উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক সরকার গড়ে তুলতে হবে।

৩। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: দেশে যথার্থ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কাউকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অযথা হয়রানি বা আটক করা যাবে না। সব ধরনের কালা-কানুন বা নিবর্তনমূলক আইন বাতিল করতে হবে।

৪। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ: সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করতে হবে।

৫। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও সংবিধানের অভিভাবকরূপে বিচার বিভাগকে গড়ে তুলতে হবে।

উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমাধানের উপায়

৬। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত না করে বিভাগ, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষমতার সুষম ও আইনানুগ বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হবে।

৭। জনগণের আস্থা অর্জন: সরকারকে কাজ-কর্ম দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া থেকে সরকারকে তথা সকল রাজনৈতিক দলকে বিরত থাকতে হবে।

৮। আমলাদেরকে নিয়ন্ত্রণ: আমলাদের ওপর রাজনৈতিক নেতাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমলাদেরকে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। আমলাদের মধ্যে জনহিতকর মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

৯। স্বাধীন প্রচার মাধ্যম: রেডিও, টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মাধ্যমকে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। রেডিও টেলিভিশনকে শর্তসাপেক্ষে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

১০। সহনশীলতা : সরকার, রাজনৈতিক দল অপরাপর সকল সংগঠনকে সহনশীল হতে হবে। 'বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা' মনোভাব ত্যাগ করে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে।

১১। সামরিক হস্তক্ষেপ বিরোধী পদক্ষেপ: বাংলাদেশে কোনো ক্ষমতালোভী ও উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা যেন ক্ষমতা দখল ও গণতন্ত্র হত্যা করতে না পারে সেজন্য জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য সংবিধানের সংশোধনী এনে সামরিক হস্তক্ষেপের সকল সম্ভাবনা দূর করতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ১২ সরকারের বিভাগ বা অঙ্গসমূহঃ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ

সরকারের বিভাগ বা অঙ্গসমূহঃ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সরকারের বিভাগ বা অঙ্গসমূহঃ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ

সরকারের কাজ তিন প্রকারের, যথা: আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত এবং বিচার সংক্রান্ত। সরকারের তিনটি বিভাগ এ কাজ সম্পাদন করে থাকে। আইন প্রণয়নের দায়িত্ব (Rule making functions) যে বিভাগ পালন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ প্রণীত আইনকে যে বিভাগ কার্যকর (Rule application Functions) করে তাকে শাসন বিভাগ বলে। যে বিভাগ আইনভঙ্গকারীর শাস্তি বিধান (Rule adjudication) করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। অতএব, সরকারের বিভাগ তিনটি, যথা: ১. আইন বিভাগ, ২. শাসন বিভাগ এবং ৩. বিচার বিভাগ।

সরকারের বিভাগ বা অঙ্গসমূহঃ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ

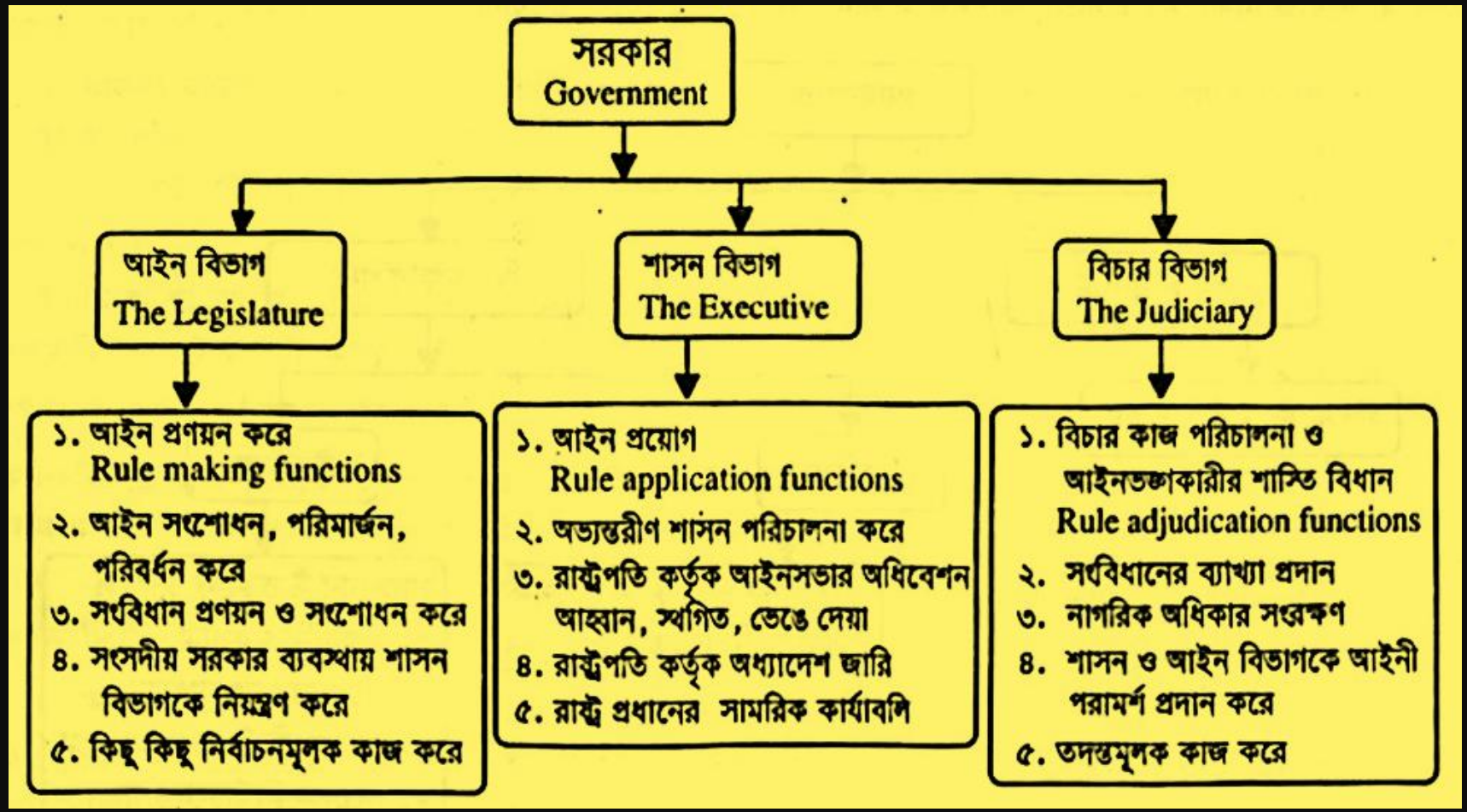

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ১৩ আইন বিভাগ

আইন বিভাগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আইন বিভাগ

আইন বিভাগ

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন সভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইন সভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। আইন সভা প্রণীত আইনকে বাস্তবায়িত করার জন্যই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইন সভার সদস্যগণ হলেন জনপ্রতিনিধি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা আইনসভায় তুলে ধরেন। সরকারের সকল কাজে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার আর্থিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। আইন সভা শাসন বিভাগকে সংগঠন করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুতও করে থাকে। আইন সভা দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও তা বাতিল বা সংশোধনও করতে পারে। সুতরাং আইনসভার মর্যাদা ও গুরুত্ব সীমাহীন।

আইন সভার গঠন

পৃথিবীতে সব গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভার সংগঠনের মাত্রা বা রূপ এক নয়। গঠন কাঠামো, সদস্য সংখ্যা, সদস্যপদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, কার্যকালের মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আইনসভার সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রা বা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তবে গঠন কাঠামোর দিক থেকে বর্তমান সময়ের আইনসভাগুলো দু প্রকারের। যথা : (১) এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ও (২) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় বলে এর জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। অপরদিকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে, আংশিক মনোনয়নের ভিত্তিতে কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে গঠিত হয়।

আইন বিভাগ

আইন সভার গঠন

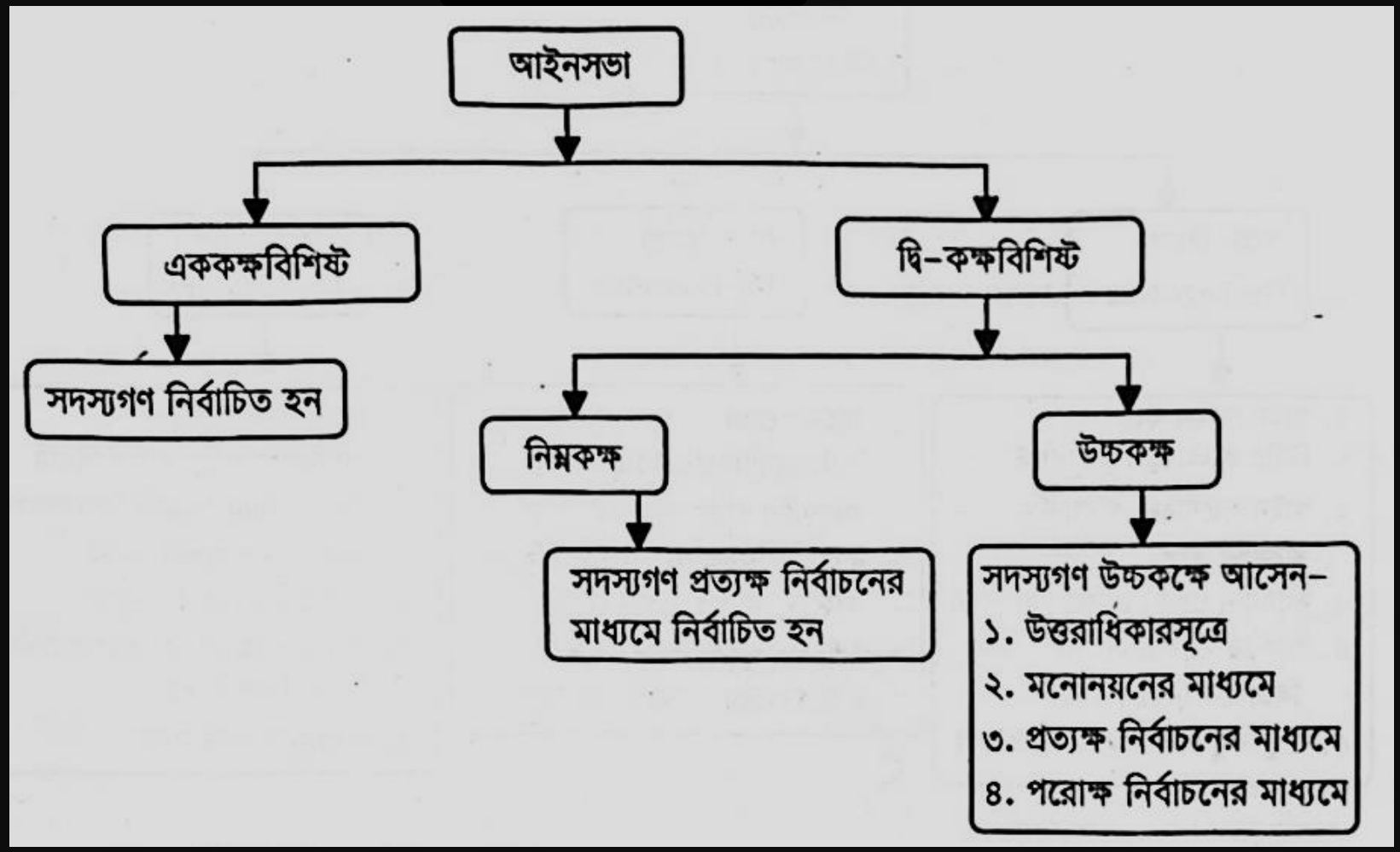

এককক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

একটি রাষ্ট্রের আইনসভা যখন একটি মাত্র কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে 'এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা' বলে। যেমন- বাংলাদেশের আইনসভা অর্থাৎ 'জাতীয় সংসদ'। এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সদস্যগণ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ, তুরস্ক, নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

এককক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি

Arguments in Favour of Unicameral Legislature

এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। অধ্যাপক লাস্কি, অধ্যাপক ম্যাকাইভার, জন স্টুয়ার্ট মিল, আবে সিয়ে প্রমুখ চিন্তাবিদ ও লেখক এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এর পক্ষে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

১. সহজ সরল গঠন প্রকৃতি: এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত সহজ ও সরল।

২. পদ্ধতিগত সুবিধা: এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নির্বাচন ক্ষেত্রে একটি মাত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৩. প্রতিনিধিত্বের একই পদ্ধতি: প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিও গোটা দেশেই এক রকম।

৪. দ্রুত আইন প্রণয়ন: দ্রুত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়। কেননা দ্বিতীয় কক্ষ না থাকায় আইন প্রণয়নে অযথা বিলম্ব ঘটে না।

৫. বিপ্লবের সম্ভাবনা নেই: দ্রুত আইন প্রণয়ন এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হওয়ায় বিপ্লব বা অসন্তোষের সম্ভাবনা কম থাকে।

৬. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্ব: এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সদস্যগণ সকলেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সুতরাং তারা জনগণের প্রতি সব সময় শ্রদ্ধাশীল থাকে।

এককক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

৭. ব্যয়বহুল নয়: এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কম ব্যয় সাপেক্ষ। অযথা দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যদেরকে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হয় না।

৮. বাহুল্য বর্জিত: আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাহুল্য বর্জিত হয়। প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও লেখক আবে সিঁয়ে তাই বলেছেন যে, "দ্বিতীয় পরিষদ যদি প্রথম পরিষদকে অনুসরণ করে তবে এটা অনাবশ্যক, আর যদি তা প্রথম পরিষদকে অনুসরণ না করে তবে এটা অনিষ্টকর।" (If the second chamber agrees with the first, it is superfluous, if it disagrees, it is pernicious.)

উপরোক্ত কারণে অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন যে, "বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাই উপযুক্ত।" (The single chamber and magnificient legislative assembly seems best to answer the needs of the modern state.)

এককক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি
Arguments Against Unicameral Legislature

লর্ড ব্রাইস, জেমস মিল, হেনরি মেইন, উইলোবি, লর্ড অ্যাকটন, দ্যুগুই, গেটেল প্রমুখ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও লেখক এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

১. স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা: বাধা দেয়ার কেউ না থাকায় এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় স্বৈরাচারী ও হঠকারিতামূলক আইন প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই জেমস মিল বলেন, "এককক্ষের হাতে ক্ষমতার মেরুকরণ কক্ষটিকে স্বৈরাচারী, অসংযমী ও দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে।"

২. ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী: এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারে।

৩. অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণয়ন: এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ভাবাবেগ, সাময়িক উত্তেজনা কিংবা জনমতের চাপে বিভ্রান্ত হয়ে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, অকল্যাণকর, অযৌক্তিক ও অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়ন করতে পারে।

৪. সংখ্যালঘুদের স্বার্থ উপেক্ষিত: এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রত্যক্ষ নির্বাচনভিত্তিক হওয়ায় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না। কেননা এরূপ ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে ব্যর্থ হয়।

৫. একঘেয়ে আলোচনা: এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রতিনিধিগণ প্রায় সম-দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় বিতর্ক প্রাণবন্ত হয় না। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় না।

এককক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

৬. জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির অনুপস্থিতি: এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রত্যক্ষনির্বাচনভিত্তিক হওয়ায় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না। ফলে আইনসভায় জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা না থাকায় এর উৎকর্ষতা হ্রাস পায়।

৭. যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনুপযোগী: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অনুপযোগী। কেননা, এরূপ ব্যবস্থায় আইনসভার পক্ষে আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৮. ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ: বর্তমান সময়ে আইনসভায় কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় একটিমাত্র কক্ষের পক্ষে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে যখন আইনসভা গঠিত হয় তখন তাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। এরূপ আইনসভার প্রথম কক্ষকে 'নিম্নকক্ষ' এবং দ্বিতীয় কক্ষকে 'উচ্চকক্ষ' বলা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি বলেন যে, "দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে সেরূপ আইনসভাকে বোঝায় যার দুটি কক্ষ আছে। প্রথম কক্ষটিকে 'নিম্ন কক্ষ' এবং দ্বিতীয় কক্ষটিকে 'উচ্চ কক্ষ' বলা হয়।" (Bi-cameral legislature is that which has two house. The first one is known as the lower house and the second one as the upper house.)

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

প্রথম কক্ষ বা নিম্নকক্ষের গঠনপ্রণালি

পৃথিবীতে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিম্নকক্ষই প্রতিনিধিত্বমূলক। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ গঠিত হয়। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হওয়ার জন্যই সাধারণত নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে অধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী।

দ্বিতীয় কক্ষ বা উচ্চ কক্ষের গঠনপ্রণালি

উচ্চ কক্ষের গঠন-প্রকৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে; যেমন-

১. ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে উচ্চকক্ষ গঠিত হয়।

২. কানাডার উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সিনেটের সদস্যগণ মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্যপদ লাভ করে থাকেন।

৩. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষ সিনেটের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

৪. ফ্রান্সের উচ্চকক্ষের সদস্যগণ পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্যপদ লাভ করে থাকেন।

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি

Arguments in Favour of Bi-cameralism

লর্ড ব্রাইস, জন স্টুয়ার্ট মিল, লেকি, হেনরি মেইন, লর্ড অ্যাকটন, দ্যুগুই, গেটেল প্রমুখ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন:

১. যুক্তরাষ্ট্রের উপযোগী: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। কেননা এর ফলে নিম্নকক্ষে নির্বাচিত সদস্যগণ জাতীয় স্বার্থ এবং উচ্চকক্ষে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্যগণ আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারে।

২. স্বৈরাচার প্রতিরোধ: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা এককক্ষের স্বৈরাচার প্রতিহত করে। লর্ড ব্রাইসের মতে, "সকল আইনসভারই স্বৈরাচারী হবার একটি অন্তর্নিহিত প্রবণতা আছে। সমক্ষমতাসম্পন্ন দুটি পরিষদ একে অপরের স্বৈরাচারিতাকে সংযত করতে পারে।"

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

৩. সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন: আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হলে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে জনকল্যাণকামী ও সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন করে জনগণের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করা যায়। লেকির মতে, "দ্বিতীয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণমূলক, সংস্কারমূলক ও সংযতকারী ক্ষমতা অপরিহার্য।"

৪. সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় সংখ্যালঘুসহ সকল শ্রেণির মানুষের পক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব। এ জন্যই দ্যুগুই বলেছেন যে, "সেই আইনসভা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে যার এককক্ষ সমস্ত জনগণের এবং অপর কক্ষ বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবে।"

৫. জনমতের প্রতিফলন: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলন হয়। এরূপ ব্যবস্থায় আইনসভার দুটি কক্ষের নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয় বলে প্রবাহমান জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটে।

৬. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা একটি মাত্র কক্ষের স্বৈরাচারিতা রোধ করে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে থাকে। লর্ড অ্যাকটন এ জন্যই বলেছেন যে, "আইনসভায় দ্বিতীয় কক্ষ হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ।"

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

৭. জাতীয় স্বার্থ: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে আইন প্রণীত হয়। ভাবাবেগবশত আকস্মিকভাবে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোনো আইন প্রণীত হতে পারে না।

৮. রাজনৈতিক চেতনার প্রসার: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে আলোচনা সমালোচনা ও তর্ক- বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তা সংবাদপত্র, বেতার বা রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত হওয়ায় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বা শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

১. জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষা: বহুজাতি সমন্বিত রাষ্ট্রে সব জাতির নিজ নিজ জাতীয় ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য দ্বিতীয় কক্ষ উপযোগী।

১০. কাজের চাপ প্রশমন: আইনসভার কাজের চাপ কমানোর জন্যও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজন।

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি

Arguments Against Bi-cameral Legislature

জেরেমি বেন্থাম, আবে সিঁয়ে, হ্যারল্ড লাস্কি, ম্যাকাইভার, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন:

১. অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকারক। এ প্রসঙ্গে আবে সিঁয়ে বলেছেন যে, "দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষকে অনুসরণ করে তবে এটা অনাবশ্যক, আর যদি তা প্রথম পরিষদকে অনুসরণ না করে তবে তা অনিষ্টকর।" (If the second chamber agrees with the first, it is superfluous; if disagrees, it is pernicious.)

২. প্রগতি বিরোধী: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রগতি বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি এ প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যের লর্ডসভার সমালোচনায় বলেছেন যে, "গণতন্ত্র যেখানেই যখন আক্রমণাত্মক ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেখানেই লর্ডসভা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে।"

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

৩. অগণতান্ত্রিক গঠন পদ্ধতি: অনেক দেশের দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার গঠন পদ্ধতি অগণতান্ত্রিক। কানাডা ও যুক্তরাজ্যের উচ্চকক্ষ ধনশালী ও রক্ষণশীল অভিজাতদেরকে নিয়ে গঠিত হয়। কানাডায় তাঁরা মনোনীত হন এবং যুক্তরাজ্যে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের নীতিতে উচ্চকক্ষের সদস্য হন।

৪. দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। এক বিভাগ অপর বিভাগকে শুধু সমালোচনা এবং একে অপরের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টায় লিপ্ত হতে পারে।

৫. সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা: সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন নেই। কেননা সংবিধানের মাধ্যমেই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. দলীয় ভিত্তি: দলীয় ভিত্তিতে যখন আইনসভার কাজ চলে তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থাতেও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা

৭. একই আইন প্রণয়নে অপ্রয়োজনীয়: একই আইন প্রণয়নের জন্য দুটি কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজন নেই। কেননা একই আইন সম্পর্কে জনগণের ইচ্ছা দুই রকমের হতে পারে না। এ জন্যই ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন যে, "দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বিপরীতমুখী গতিসম্পন্ন অশ্ব ও অশ্বযানেরই মতো।"

৮. দ্রুত আইন প্রণয়নে অসুবিধা: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দ্রুত আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। অধিকাংশ লেখকের মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাই উত্তম। আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষ সৃষ্টি করে সরকারের কার্যকলাপকে সীমিত এবং চলার গতিকে মন্থর না করে দেওয়াই ভালো। তবে যদি দ্বিতীয় কক্ষের গঠন পদ্ধতি সংশোধন করে এর গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া যায় তাহলে এ ব্যবস্থাও খারাপ নয়।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আইনসভার সংগঠন

গ্রেট ব্রিটেন ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সাধারণত এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা লক্ষ করা যায়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ভালো। কেননা কোনো প্রদেশ, অঞ্চল বা এলাকার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইনসভার আলাদা কোনো কক্ষের প্রয়োজন নেই।

অনেকেই মনে করেন যে, যেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেখানে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকলে নিম্নকক্ষে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্যগণ আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। এজন্য পৃথিবীর সব যুক্তরাষ্ট্রেই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের নীতি অনুসারে গঠিত দ্বি-কক্ষ অগণতান্ত্রিক। তাছাড়া দলীয় ভিত্তিতে যখন বর্তমানে সব যুক্তরাষ্ট্রেই আইনসভার কাজ চলছে তখন দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার কোনো প্রয়োজন নেই।

সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইনসভার সংগঠন

সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এরূপ রাষ্ট্রগুলোতে কোথাও কোথাও এককক্ষবিশিষ্ট আবার কোথাও কোথাও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। গ্রেটব্রিটেন, ভারত, কানাডাসহ অনেক রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। ঠিক তেমনি নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশসহ অনেক রাষ্ট্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। তবে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দলীয় শাসন এবং দলীয় ভিত্তিতেই আইনসভায় কাজকর্ম চলে। সেজন্য এখানে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাই উত্তম।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় যেমন দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে, তেমনি এরূপ অনেক রাষ্ট্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাও রয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন প্রচলিত রয়েছে এবং এর পাশাপাশি সেখানে যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও প্রচলিত থাকে তবে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রাখা ভালো বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকেই বলেন যে, যেহেতু পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থাতেই দলীয় ভিত্তিতে আইনসভার কাজ চলে, সেহেতু দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অপ্রয়োজনীয়।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভার সংগঠন

পৃথিবীর প্রায় সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বর্তমানে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যদি আয়তনে বিশাল হয়, বহু জাতি, গোষ্ঠী নিয়ে যদি এরূপ রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তাহলে তাদের সকলের আঞ্চলিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেহেতু একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এবং ক্ষমতাসীন দলই যেহেতু রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, শ্রেণি শোষণ ও শ্রেণিদ্বন্দু সেখানে থাকে না, সেহেতু সেখানে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজনীয়তা ততটা আর নেই।

একনায়কতন্ত্রে ও সামরিকতন্ত্রে আইনসভার প্রকৃতি

একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্র একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উভয় ব্যবস্থাই গণতন্ত্রবিরোধী ও স্বৈরতান্ত্রিক। উভয় ব্যবস্থাতেই আইনসভা গুরুত্বহীন। একনায়কতন্ত্রে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। আইনসভা থাকলেও তা নামমাত্র। আইনসভার নির্বাচন হয়, কিন্তু তা লোক দেখানো। আইনসভায় শুধুমাত্র একনায়কের নিজ দলের সদস্যগণ থাকায়, যে আলোচনা ও বিতর্ক হয় তা অনেকটা প্রহসন বা লোক দেখানো। একনায়ক পছন্দ করেন না এমন কোনো বিষয়ই আইনসভায় আলোচনা বা উত্থাপন করতে কোনো সদস্য সাহসী হন না।

সামরিকতন্ত্রে আইনসভার অবস্থা আরো করুণ। কেননা সামরিক শাসকগণ ক্ষমতায় এসেই আইনসভার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। অবশ্য অনেক দেশেই বর্তমানে সামরিক শাসকগণ নিজেদের শাসনকে বেসামরিকীকরণের বা বৈধকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন এবং গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে আইনসভার নির্বাচনও অনুষ্ঠান করছেন। কিন্তু সামরিক শাসনে আইনসভার নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় না। যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন সামরিক শাসক তার নিজের গড়া কিংবা তাকে সমর্থন দানকারী দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে সাহায্য করেন। ফলে সামরিক শাসনে আইনসভার সদস্যগণ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে ভয় পান। আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় না।

আইন বিভাগ

আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

আইন বিভাগের কাজ প্রথমে ছকের সাহায্যে এবং পরে আলোচনা করে বোঝানো হলো :

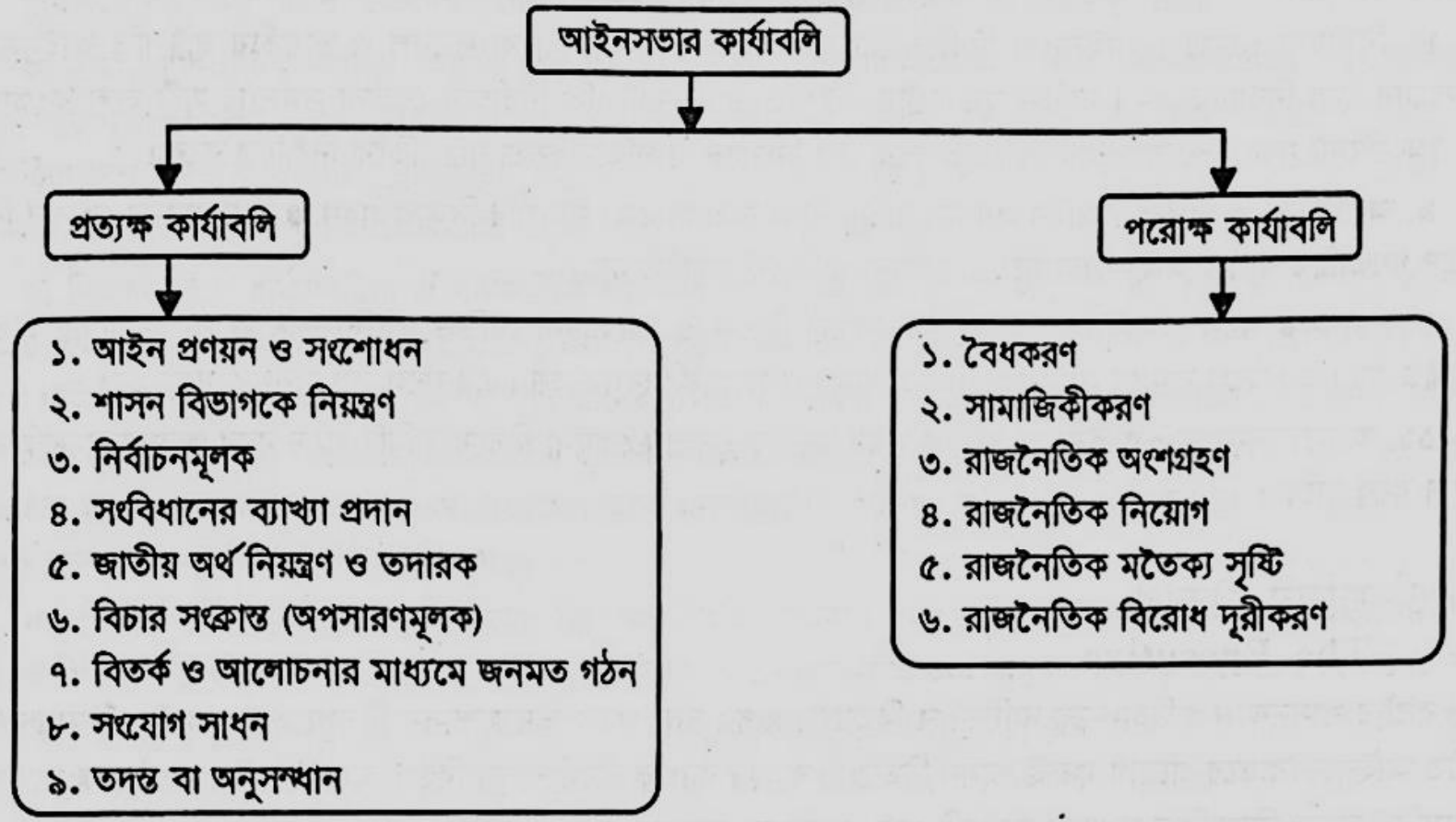

আইন বিভাগ

আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১. আইন প্রণয়ন : আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকে। আইনসভা শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন: আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণপরিষদ ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ সংবিধান' রচনা করে। পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভাও সংবিধান প্রণয়ন এবং তা সংশোধন করে থাকে।

৩. সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান: পৃথিবীতে অনেক দেশেই আইনসভা সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা সে দেশের সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করে থাকে।

৪. জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারসমূহ প্রতি আর্থিক বছরের শেষ দিকে পরবর্তী বছরের জন্য আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব বা 'বাজেট' আইনসভায় পেশ করে থাকে। আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক বাজেটের ওপর আলোচনা, সমালোচনা ও বিতর্কের পর তা গৃহীত হলে কার্যকর হয়।

আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৫. শাসনসংক্রান্ত : আইনসভা অনেক দেশেই কিছু কিছু শাসন সম্পর্কিত কাজও করে থাকে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সম্মতিক্রমেই সে দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন। সিনেটের অনুমোদন ছাড়া সন্ধি, চুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করা সে দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষে সম্ভব নয়।

৬. বিচারসংক্রান্ত : অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যে কোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। ব্রিটিশ লর্ড সভা হচ্ছে সে দেশের সকল মামলার আপিল বিচারের চূড়ান্ত আদালত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা সে দেশের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদেরকে অভিযুক্ত করে অপসারিত করতে পারে।

৭. শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ: সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আইন সভা সাধারণত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ও আলোচনা, নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন, মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৮. নির্বাচনসংক্রান্ত: আইনসভা নির্বাচনসংক্রান্ত কাজও করে থাকে। বাংলাদেশ ও ভারতীয় রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট সভা উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে এবং নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধিসভা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে।

৯. আলোচনা ও বিতর্ক: আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয় প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভাসমূহে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

১০. জনমত গঠন: আইনসভায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিতর্ক ও আলোচনা রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এর ফলে জনগণ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হয়। এর ফলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে।

১১. অনুসন্ধানমূলক : আইনসভা অনেক সময় জনগুরুত্বসম্পন্ন কোনো বিষয়ে কমিটি গঠন করে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ১৪ শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগ

This Topic is important for

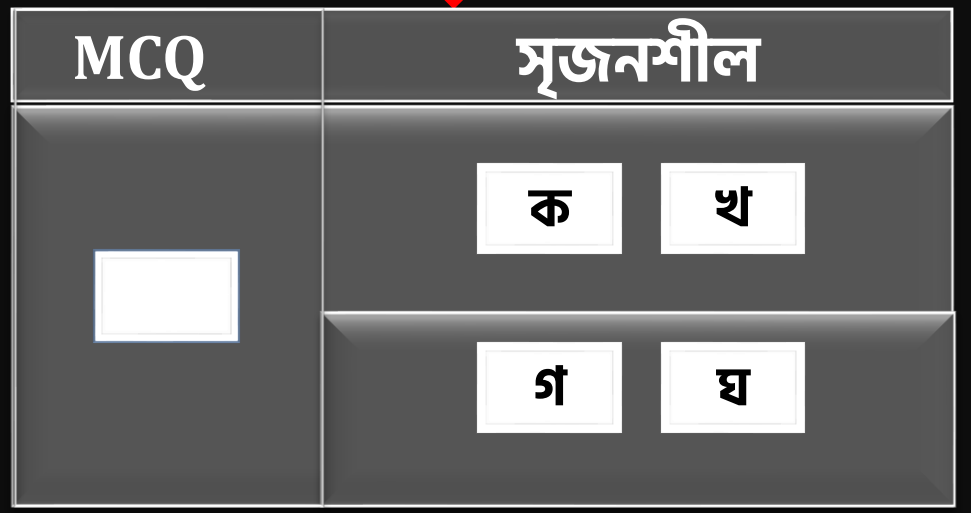

শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করাই শাসন বিভাগের কাজ। ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলকে বোঝায়। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা এবং তার মন্ত্রিপরিষদকে বোঝায়।

গঠন ও কার্যাবলির ভিত্তিতে শাসন বিভাগ দু ভাগে বিভক্ত; যথা: (১) রাজনৈতিক শাসক (Political Executive) এবং (২) অ-রাজনৈতিক শাসক (Non-Political Executive)। শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তারা তাদের সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকারী স্থায়ী, বেতনভোগী কর্মচারীরা হলো শাসন বিভাগের অ-রাজনৈতিক অংশ।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের সংগঠন

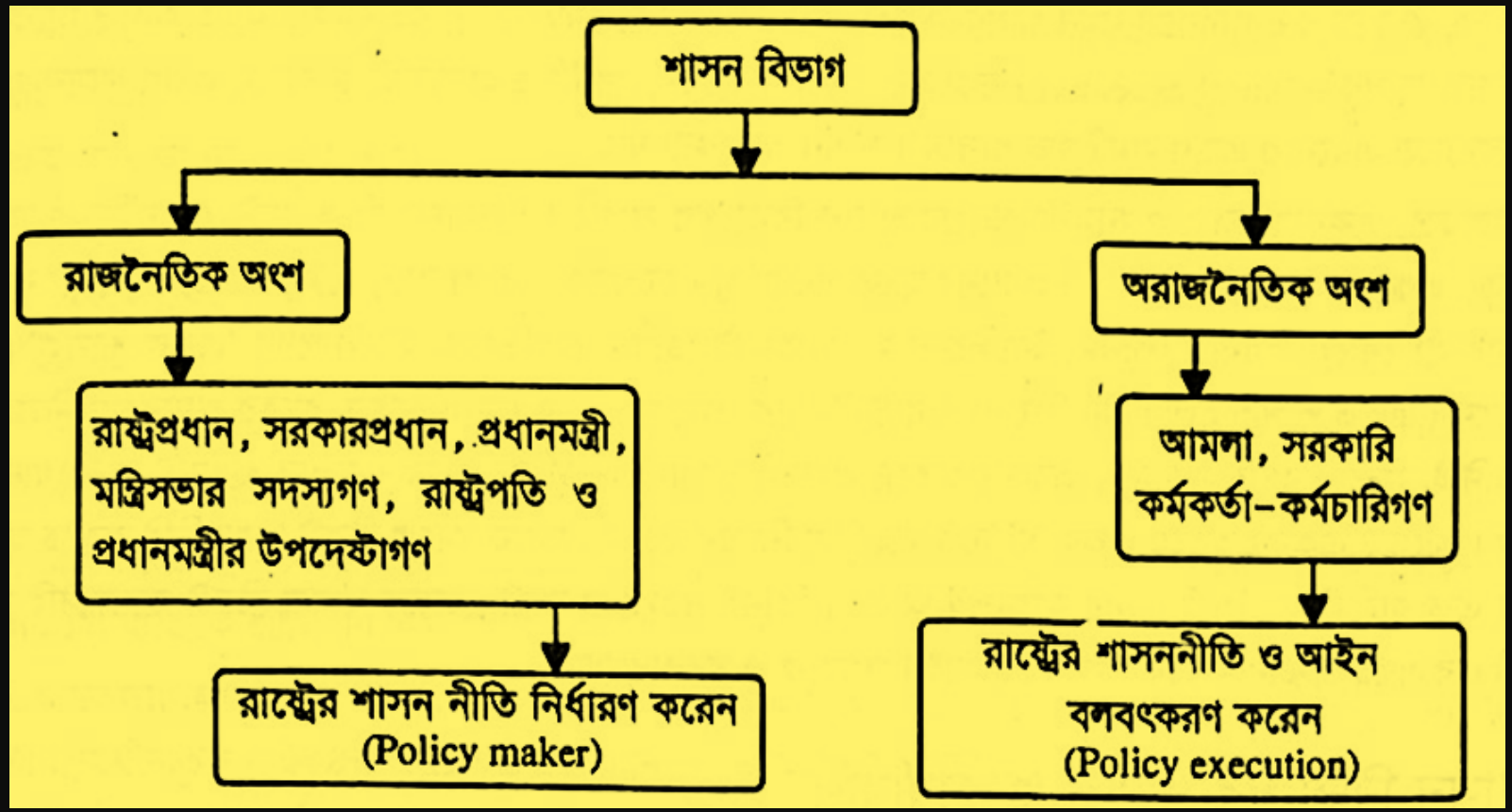

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের সংগঠন

পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের সংগঠন একরূপ নয়। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ক. নামমাত্র ও প্রকৃত শাসক: অনেক রাষ্ট্র রয়েছে যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান নামমাত্র শাসক। ব্রিটিশ রাজা বা রানি, জাপানের রাজা, ভারতের ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হলেন এরূপ নামমাত্র শাসক। এঁরা রাজত্ব করেন বা এঁদের নামে দেশ শাসিত হয়। তবে এঁরা দেশ শাসন করেন না (reigns but does not govern)। এসব রাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। মূলত প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃত শাসক বা সরকারপ্রধান।

খ. নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক ও ধর্মতান্ত্রিক শাসক: যে সব রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে আবার সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্রও রাখা হয়েছে সেসব দেশের প্রধান শাসক হচ্ছেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। এঁদের নামে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হলেও এঁরা প্রকৃত শাসক নন। তাঁদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সাংবিধানিক ও আইনানুগ। ব্রিটিশ রাজা বা রানি, জাপানের রাজা, ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। গ্রেট ব্রিটেন, জাপানসহ বেশ। কছু রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও রাজতন্ত্রকে বহাল রাখা হয়েছে। তবে এসব রাজার পদকে সাংবিধানিক ও নামমাত্র করা হয়েছে। প্রকৃত শাসক হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভা।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের সংগঠন

গ. ধর্মতান্ত্রিক শাসক : মধ্যযুগে ধর্মের ছিল অপ্রতিহত প্রাধান্য। ধর্মগুরু বা ধর্মীয় প্রধান মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজা-বাদশাগণও ছিলেন তাঁদের অনুগত। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সেদিন আর নেই। ভ্যাটিকান সিটির মতো রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান একাধারে প্রধান শাসক এবং প্রধান ধর্মীয় গুরু। ইরানে অবশ্য ধর্মতান্ত্রিক প্রধান সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধান নন। তবে ইরানে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রের সব কিছুর ওপর ধর্মীয় প্রধানের প্রভাব অসামান্য।

ঘ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত রাষ্ট্রের শাসক: সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান নামমাত্র শাসক। প্রকৃত শাসক হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপ্রধানের নামে সব কিছু পরিচালিত হলেও প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভা।

অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় যিনি রাষ্ট্রপ্রধান, তিনিই সরকারপ্রধান। রাষ্ট্রপতি একাধারে দেশের প্রধান শাসক এবং সরকারপ্রধান। তাকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকলেও এর সদস্যগণকে তিনি যেকোনো সময় নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের সংগঠন

৬. একক ও সমষ্টিগত শাসক শাসন বিভাগ যখন এক ব্যক্তির নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তখন তাকে একক পরিচালক বা শাসক বলা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের শাসকগণ হলেন একক শাসক। অপরদিকে, এক ব্যক্তির পরিবর্তে যখন শাসন ক্ষমতা সমমর্যাদা ও সমক্ষমতাসম্পন্ন বহু ব্যক্তির হাতে অর্পিত থাকে তখন তাকে 'সমষ্টিগত শাসক' (Plural executive) বলা হয়। প্রাচীন এথেন্স, স্পার্টা ও প্রজাতান্ত্রিক রোমে এরূপ শাসন প্রচলিত ছিল। সুইজারল্যান্ডে এখনোও এরূপ সমষ্টিগত শাসকের শাসন লক্ষ করা যায়।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের সংগঠন

চ. সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের শাসন বিভাগের সংগঠন: সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একদলীয় ও সর্বাত্মক শাসন প্রচলিত। এরূপ রাষ্ট্রে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধানের হাতে সর্বময় ক্ষমতা থাকে। এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী নেতা। আবার লেনিন, স্ট্যালিনের সময় তারাই ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'একক শাসক'। চীনে মাওসেতুং ছিলেন একক শাসক। কিউবায় ফিদেল ক্যাস্ট্রো 'একক শাসক'। তবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসকগণ নিজ দলের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। একনায়কতন্ত্রে একদলীয় শাসন প্রচলিত থাকে। দলীয় প্রধানই রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধান। কাজেই একনায়কতন্ত্রে একক শাসকই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাকে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। সামরিকতন্ত্রে এক ব্যক্তিই সর্বেসর্বা। তাঁর আদেশই আইন। তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাকে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। তিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সরকারপ্রধান।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

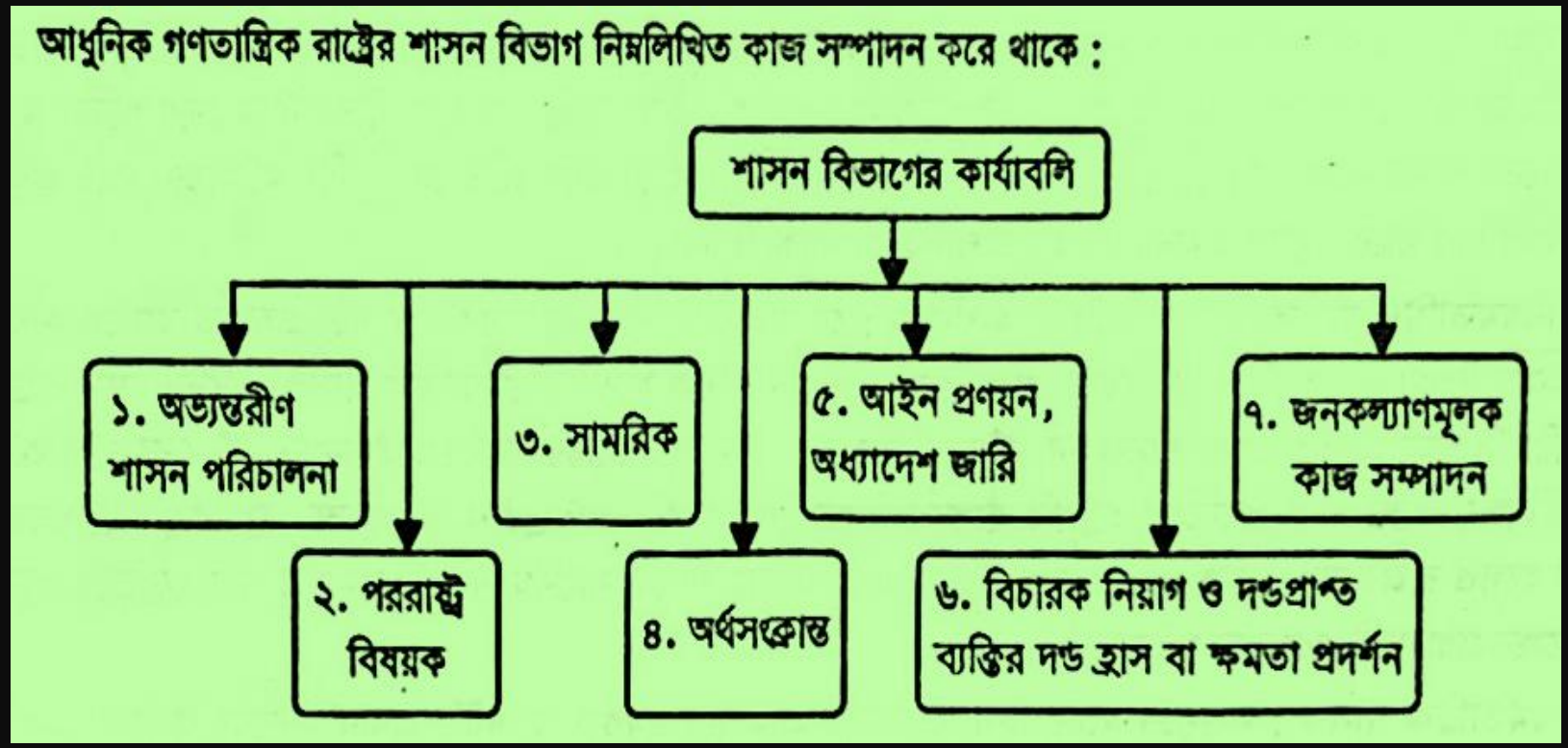

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১. অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা: শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান, বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান; প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ প্রভৃতি প্রণয়ন করে থাকে।

২. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলি: বর্তমান সময়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্য দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে এবং অন্য দেশ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে নিজ দেশে গ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়াও সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। এসব কাজকে কূটনৈতিক বা পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কাজ বলে। এসব কাজের দায়িত্ব পালন করে শাসন বিভাগের অন্তর্গত 'পররাষ্ট্র দপ্তর' (Department of External Affairs) ।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৩. সামরিক কার্যাবলি : যুদ্ধ ঘোষণার বিষয়টি অনেক সময় আইন বিভাগের সম্মতির ওপর নির্ভর করলেও যুদ্ধ। পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে শাসন বিভাগের। রাষ্ট্রপ্রধান পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীরও সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of the Armed Forces)। সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদচ্যুত, সেনাবাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা করে থাকেন। রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনবোধে সামরিক আইনও জারি করতে পারেন।

৪. অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি সরকারের শাসন বিভাগ যেমন অর্থ ব্যয় করে তেমনি এ বিভাগকে অর্থ সংগ্রহও করতে হয়। আইনসভার সম্মতিক্রমে শাসন বিভাগ সাধারণত কর ধার্য, সেবামূলক কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে অর্থ সংগ্রহ এবং তা ব্যয় করে থাকে।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৫. আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যাবলি: শাসন বিভাগ কিছু কিছু আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে থাকে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। কেননা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত এবং প্রয়োজনবোধে আইনসভা ভেঙেও দিতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে রাষ্ট্রপ্রধান জরুরি আইন বা 'অধ্যাদেশ' (Ordinace) জারি করতে পারেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 'ভেটো ক্ষমতা' প্রয়োগ করে বিশেষ কোনো আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারেন।

৬. বিচারসংক্রান্ত কার্যাবলি: অধিকাংশ রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করে থাকেন। কোনো বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমা প্রদর্শন, কিংবা তার দণ্ড হ্রাস করতে পারেন।

৭. জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি: আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, জন শিক্ষা, কৃষ্টি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ১৫ বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ

This Topic is important for

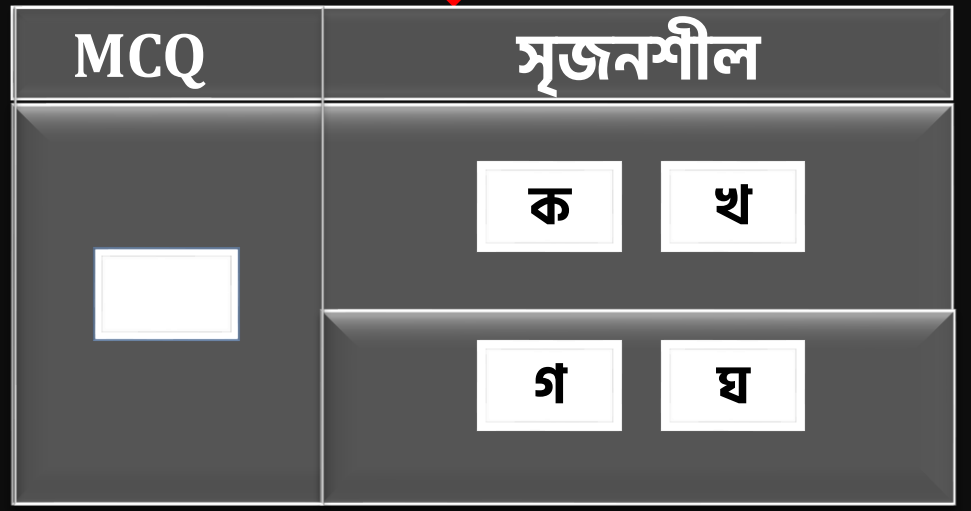

বিচার বিভাগ

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। সিজউইক (Sidgwick) এর মতে, 'বিচার বিভাগ হচ্ছে সেই বিভাগ যা আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে।" ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে বিচার বিভাগ আইনের আলোকে তার মীমাংসা ও ন্যায়বিচার করে থাকে।

যে কোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের দক্ষতাও অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। লর্ড ব্রাইস এ জন্যই বলেছেন যে, বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা কোনো সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর উপযোগী মানদণ্ড আর নেই।" বিচার বিভাগের অস্তিত্ব ছাড়া সুসভ্য সামাজিক জীবন কল্পনা করা যায় না। সমাজজীবনে সম্ভাব্য সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রধান শক্তিই হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ আছে বলেই একটি দেশের সরকার সংবিধান নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য হয়। সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না। কোনো কোনো দেশে বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে সে দেশের সাংবিধানিক সরকারের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে। একটি জাতির নৈতিক মান বৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচার সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা অসামান্য।

বিচার বিভাগ

এ জন্যই অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন যে, “একটি রাষ্ট্র কীভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করে তার দ্বারা সে রাষ্ট্রের নৈতিকতার মান সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়।” 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের' পাশাপাশি প্রত্যেক দেশের বিচার বিভাগই রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সমুন্নত রেখে জনজীবনে সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং স্থিতিশীল শাসন কায়েম করে। এ জন্যই সিজউইক বলেছেন যে, "রাজনৈতিক সভ্যতায় একটি জাতির অবস্থান নির্ণয়ে বিচার বিভাগের ভূমিকা যাচাই করার থেকে আর কোনো মাপকাঠি শ্রেষ্ঠ নয়।” (In determining a nation's rank in political civilisation, no test is more decisive than the degree in which justice, as defined by law, is actually realised in its judicial administration.)

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের সংগঠন

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের গঠন কাঠামো স্তরভিত্তিক। বিচার বিভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে গ্রাম আদালত, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সালিসী আদালত। নিম্নে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. নিম্ন আদালত : অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্ন আদালত দুভাবে বিভক্ত; যথা (১) ফৌজদারি আদালত ও (২) দেওয়ানি আদালত। ফৌজদারি আদালতে অপরাধ সংক্রান্ত বিবাদের বিচার হয়। দেওয়ানি আদালতের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদগুলোর বিচার হয়। ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ফৌজদারি মামলার বিচার করে থাকেন। এসব ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হতে দায়রা জজের আদালতে আপিল পেশ করা যায়। পূর্বে উপজেলা পর্যায়ের বিচারের জন্য 'মুন্সেফ আদালত' গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে সহকারী জজগণ উপজেলার বিচারের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জেলা সদরে "সাব-জজ আদালত" রয়েছে, যা বর্তমানে "যুগ্ম জেলা জজ" আদালত নামে অভিহিত। যুগ্ম জেলা জজগণ যখন ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করেন তখন তাঁরা "সহকারী দায়রা জজ" হিসেবে অভিহিত হন। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার সালিসী আদালত।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের সংগঠন

২. জেলা জজের আদালত বা মাধ্যমিক স্তরের আদালত: মাধ্যমিক স্তরের আদালত হলো দেওয়ানি মামলার জন্য জেলা জজের আদালত এবং ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির জন্য "দায়রা বা সেসন জজ আদালত।" এছাড়া রয়েছে অতিরিক্ত জেলা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালত। কিন্তু অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজগণ সরাসরি কোনো মামলা গ্রহণ করেন না। জেলা জজ প্রেরিত মামলার বিচারই শুধু তাঁরা করে থাকেন। নিম্ন আদালত হতে প্রদত্ত রায় পুনর্বিবেচনার জন্য মধ্যস্তরের অর্থাৎ জেলা জজ আদালতসমূহে আপিল করা হয়। এসব আদালতে বড় বড় মামলার প্রথম শুনানী ও বিচার হয়। অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং দায়রা জজের প্রধান আদালত আসামীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করতে পারে। তবে এরূপ মৃত্যুদণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের অনুমোদন লাভ করতে হয়।

বর্তমানে "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত" নামে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ আদালত দায়রা জজ আদালতের সমমানের।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের সংগঠন

৩. উচ্চ আদালত: সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালত 'আপিল বিভাগ' ও 'হাইকোর্ট বিভাগ' নিয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপিল বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। বিরাট অংকের মূল্য জড়িত মামলা এবং সংবিধানের গুরুতর প্রশ্ন জড়িত মামলার প্রথম শুনানী এই সর্বোচ্চ আদালতে গ্রহণ করা হয়। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী গ্রহণ ও বিচার করা হয় সুপ্রিম কোর্টে।

বিচার বিভাগ

বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি

নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে বিচারকদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে; যথা: (১) জনগণ বা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচন, (২) আইনসভা কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচন এবং (৩) শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করা হলো:

১. জনগণ বা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচন: ফ্রান্সে জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। তবে ফ্রান্সে এই নিয়োগ পদ্ধতি এখন আর প্রচলিত নেই। বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কতগুলো অঙ্গরাজ্যে, সুইজারল্যান্ডের অধঃস্তন আদালতসমূহে এরূপ নিয়োগ পদ্ধতি এখনও প্রচলিত রয়েছে। জনগণ কর্তৃক বিচারক নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ। কেননা জনগণ দলীয় প্রচারে ও ভাবাবেগে বিভ্রান্ত হয়ে অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে পারে। যোগ্য ব্যক্তিগণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী নাও হতে পারে। এরূপ পদ্ধতি সম্পর্কে হ্যারল্ড লাস্কি বলেছেন যে, "বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচন হচ্ছে ব্যতিক্রমহীনভাবে নিকৃষ্ট।" (Of all methods of appointment, that of election by the people at large, is without exception the worst.)

২. আইনসভা কর্তৃক পরোক্ষ নির্বাচন: সুইজারল্যান্ডের বিচারকগণ আইনসভা কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তবে অনেকেই এরূপ নিয়োগ পদ্ধতি সমর্থন করেন না। কেননা এর ফলে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত ব্যক্তিরাই শুধু বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হবেন এবং নিজ দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করবেন।

বিচার বিভাগ

বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি

৩. শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ: শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। এর ফলে বিচারকগণের পক্ষে রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা জনগণের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্ভব। এরূপ পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে বিচারপতিদের দ্বারা গঠিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বা সুপারিশকৃত লোককেই রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিচারক পদে নিয়োগ করা উচিত।

বিচার বিভাগ

বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি

বিচার বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. বিচারসংক্রান্ত কাজ: বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রয়োগ করা। বিচার বিভাগ বিভিন্ন মামলায় রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকে।

২. আইনের ব্যাখ্যা: বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ হচ্ছে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান। বিচারকগণ যদি আইনসভা প্রণীত কিংবা প্রথাগত আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট বা পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করে তাহলে এর ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। আইনের এই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে নজির বা আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. আইন প্রণয়নমূলক কাজ: বিচারকগণ কোনো মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে যদি মনে করেন যে, মামলাটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণীত হয়নি, তাহলে তারা নিজেদের ন্যায়বোধ ও সুবিবেচনা প্রয়োগ করে আইনটির ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা নতুন আইন তৈরি করে মামলাটির বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন। বিচারক প্রণীত এরূপ আইন বা আইনের ব্যাখ্যাকে পরবর্তী সময়ে নজির হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এসব আইনকে 'বিচারক প্রণীত আইন' (Judge-made law) বলে।

বিচার বিভাগ

বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি

৪. সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রাধান্য রক্ষণসংক্রান্ত কাজ: বিচার বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের অভিভাবক। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে কেন্দ্র ও অঙ্গরাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত বিচারপতি হিউজেস বলেছেন, "আমরা একটি সংবিধানের অধীন, কিন্তু বিচারকগণ যা বলেন তাই সংবিধান" (We are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is.) ।

৫. নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ: বিচার বিভাগ নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে
দায়িত্ব পালন করে। সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে বিচার বিভাগ তা প্রতিহত করে।

৬. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বিচার বিভাগের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিচার বিভাগ মামলা পরিচালনায় সত্য অনুসন্ধানের জন্য নথিপত্র তলব ও সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে অপরাধীর শাস্তি প্রদান করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পবিত্র কর্তব্য পালন করে থাকে।

বিচার বিভাগ

বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি

৭. পরামর্শদান সংক্রান্ত কাজ: আইনের জটিল প্রশ্ন নিরসনে কিংবা সংবিধানসংক্রান্ত জটিল প্রশ্নে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নিকট পরামর্শ চাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ সঠিক পরামর্শ প্রদান করে আইনগত ও সাংবিধানিক জটিলতা নিরসনে সাহায্য করে থাকে।

৮. তদন্তসংক্রান্ত কাজ: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের সম্পত্তি ও জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করা। এ জন্য বিচার বিভাগ জোরজবরদস্তিমূলক অপরাধ এবং দুর্ঘটনার তদন্ত করে থাকে।

৯. শাসনসংক্রান্ত কাজ: বিচার বিভাগ নিজ বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ, নাবালকদের সম্পত্তি দেখাশোনা এবং নাবালকদের জন্য অভিভাবক নিয়োগ, লাইসেন্স প্রদান এবং দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিচার বিভাগ

প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ

বর্তমানে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হন। অনেক রাষ্ট্রেই সরকারপ্রধান ও প্রভাবশালী শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ বিচার বিভাগের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। অনেক দেশে জেলা ও থানা পর্যায়ে আমলা-প্রশাসকগণ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও পরিচালনা করে থাকেন। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। যথার্থ আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

বিচার বিভাগ

প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ

বর্তমানে প্রায় সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, চিন্তাশীল ব্যক্তি, আইনজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবিগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিচার বিভাগকে অবশ্যই প্রশাসন বা শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে। শাসন বিভাগ বা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠার দাবি বর্তমানে সর্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়েছে। এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

১. বিচার বিভাগকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

২. কেন্দ্র হতে দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিচার বিভাগের সব স্তরে বিচার বিভাগীয় ক্যাডারের লোক নিয়োগ করতে হবে।

৩. স্থায়ী বিচারকমণ্ডলীর সুপারিশ ছাড়া সর্বোচ্চ বিচারালয়ে কোনো ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা যাবে না।

৪. প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক আদালত ব্যবস্থা রহিত করতে হবে।

৫. যথার্থ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বাংলাদেশ প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু অতীতে এ নিয়ে কোনো সরকারই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়নি। অতি সম্প্রতি প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক ও স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের ক্ষমতা বা স্বাধীনতা। স্বাধীন বিচার বিভাগ বলতে তাই শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিচার বিভাগকে বোঝায়।

কেন্ট (Kent) বলেন, "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় এ বিভাগের নিরপেক্ষতা ও অন্য বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা।"

বিচারপতি আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন (A. Hamilton) বলেন, "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হলো সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারের রায় ঘোষণা করা।"

সিজউইক (Sidgwick) এর মতে, "সম্পূর্ণরূপে প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন থেকে ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে নিরপেক্ষতার নীতি অনুযায়ী বিচার কাজ সম্পন্ন করাকেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে।"

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অসীম। গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য যে সকল শর্ত পূরণ করতে হয় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কেননা ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ, আইন ভঙ্গকারীর শাস্তিবিধান, সংবিধানের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বিচার বিভাগ সম্পাদন করে থাকে। লর্ড ব্রাইস এ জন্যই বলেছেন যে, "বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতা অপেক্ষা সরকারের উৎকর্ষ বিচারের আর কোনো শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড নেই"
(There is no better test of the excellence of a government than the efficiency of its judicial system.) ।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগকে তাই স্বাধীন, দুর্নীতিমুক্ত ও নিরপেক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা বিচারকরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়লে কিংবা চাপ ও ভয়-ভীতির শিকার হলে ন্যায়বিচার পদদলিত হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে ধনী, সবল ও দুষ্টরাই টিকে থাকবে; দুর্বল, দরিদ্র ও নিরীহ মানুষ তাদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে বাধ্য হবে। ন্যায়বিচারের বাতি নিভে গেলে নিশ্চিত ও ভয়াবহ অন্ধকারের সৃষ্টি হবে- গণতন্ত্র তখন শূন্যগর্ভ তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হবে। এ জন্য গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সবার আগে প্রয়োজন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা এবং তা সযত্নে সংরক্ষণ করা।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ নিম্নরূপ :

১. বিচারকদের যোগ্যতা: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইনজ্ঞ, সৎ, সাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকে বিচারপতি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। অধ্যাপক গার্নার এজন্যই বলেছেন যে, "বিচারকগণ যদি জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধের অভাবে রায় দিতে অসমর্থ হন তবে বিচার বিভাগ যে উচ্চ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা রক্ষা হবে না।" (If the judge, lack wisdom, Probity and freedom of decision, the high purposes for which the judiciary is established can not be secured.)

২. বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি: বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিই উত্তম। এক্ষেত্রে একটি স্থায়ী বিচারকমণ্ডলীর কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ করা উচিত।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

৩. বিচারকগণের কার্যকাল: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান প্রয়োজন। কার্যকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকলে বিচারকগণ নির্ভীক ও সততার সাথে বিচারকাজ সম্পাদন করতে পারবেন।

৪. বিচারকগণের অপসারণ: বিচারপতিদের অপসারণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক অভিশংসন প্রস্তাব (Impeachment motion) এবং বিচার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশে বিচারকদেরকে অপসারণ করা উচিত।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

৫. বিচারকদের উপযুক্ত বেতন ভাতাদি এবং সামাজিক মর্যাদা: বিচারকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন, ভাতাদি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত। এর ফলে তারা সৎ ও নির্লোভ থাকবে। তাঁরা হীনমন্যতাবোধে ভুগবে না। ভবিষ্যতে সৎ ও মেধাবী আইনজ্ঞগণ বিচারক হতে আগ্রহী হবেন।

৬. পদোন্নতি: বিচারকদের কর্মদক্ষতার জন্য পদোন্নতির বিধান থাকতে হবে। সময়মত পদোন্নতি না পেলে বিচারকগণ হতাশায় ভুগবেন। তবে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতা দুটোকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

৭. বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য: এরিস্টটল থেকে মন্টেস্কু পর্যন্ত অনেক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বলেছেন যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ না থাকলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সংরক্ষিত হয় না। লাস্কির মতে, "স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য অত্যাবশ্যক।"

৮. জনগণ ও রাজনীতিবিদদের আগ্রহ: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য জনগণ ও রাজনীতিবিদদের আগ্রহ থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চাপ প্রয়োগ ও আন্দোলন করতে হবে। জনমত গড়ে তুলতে হবে।

৯. জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস: বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস অটুট রাখা এবং তা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব বিচারকগণেরই। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অটুট থাকলে ক্ষমতাসীন শাসকগণ বিচারকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহসী হবেন না।

বিচার বিভাগ

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ণয়ের জন্য বিচার বিভাগের দক্ষতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিচার বিভাগের অস্তিত্ব ছাড়া সুসভ্য সামাজিক জীবন কল্পনা করা যায় না। সমাজজীবনে সম্ভাব্য সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার নির্যাতন, নিপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রধান শক্তিই হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ আছে বলেই একটি দেশের সরকার সংবিধানের নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য হয়। 'দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনে' প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বিচার বিভাগ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সমুন্নত রেখে স্থিতিশীল শাসন কায়েম করে এবং জনজীবনে সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হলো আইনের শাসন। অধ্যাপক এ.ভি. ডাইসি-এর মতে, আইনের শাসনের অর্থ হলো- (ক) আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, (খ) সকলের জন্য একই ধরনের আইন থাকবে, (গ) বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না, (ঘ) বিনা বিচারে কাউকে আটক করা যাবে না, (ঙ) অভিযুক্তকারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে এবং (চ) সকল মানুষের জন্য অভিন্ন বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

বিচার বিভাগ

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যথার্থ আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা আইন না থাকলে যেমন অনাচার সৃষ্টি হয় তেমনি আইন না মানলে সমাজ ও রাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। অনেক দেশেই আইন আছে কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। জনগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। এজন্যই বলা হয় যে, যথার্থ আইনের শাসন না থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অধিকার ও সাম্য বলতে কিছুই থাকে না।

তবে আইনের শাসন কথাটি শুধু মুখে মুখে স্বীকার বা সংবিধানে সন্নিবেশিত করলেই হবে না, এর বাস্তব প্রয়োগও ঘটাতে হবে। এটা সম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তোলার মাধ্যমে। এজন্যই সিজউইক বলেছেন যে, 'রাজনৈতিক সভ্যতায় একটি জাতির অবস্থান নির্ণয়ে বিচার বিভাগের ভূমিকা যাচাই করার থেকে আর কোনো মাপকাঠি শ্রেষ্ঠ নয়।”

বিচার বিভাগ

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের পারস্পারিক সম্পর্ক

সরকারের কাজ তিন প্রকারের, যথা আইন প্রণয়ন করা, শাসন কাজ পরিচালনা করা এবং বিচার করা। সরকারের তিনটি বিভাগ এ কাজ সম্পাদন করে থাকে। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ সে আইন প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে থাকে। এ তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হয়।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে আইনসভার আস্থা-অনাস্থার ওপর। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। বাংলাদেশ, ভারতের মতো রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিকেও আইনসভা নির্বাচন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও 'সরকারি কর্মচারী নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান তাদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

বিচার বিভাগ

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের পারস্পারিক সম্পর্ক

বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও এগুলোর সদস্যপদ গ্রহণ এবং সেখানে প্রতিনিধি প্রেরণ করা শাসন বিভাগের কাজ। এমনকি শাসন বিভাগ কিছু কিছু আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কাজও করে থাকে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে। কেননা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ আইনসভারই সদস্য। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও প্রয়োজনবোধে ভেঙে দিতে পারেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 'ভেটো ক্ষমতা' প্রয়োগ করে কোনো আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারেন। সেদেশে রাষ্ট্রপতির মনোনয়নসমূহ সিনেট অনুমোদন করে থাকে।

বিচার বিভাগ

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের পারস্পারিক সম্পর্ক

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের সাথে সরকারের অন্য দুটি বিভাগের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অনেক রাষ্ট্রেই বিচার বিভাগ ন্যায়নীতির মাধ্যমে অনেক সময় আইন প্রণয়ন করে। একাধিক আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও বিচারকগণ নতুন নতুন আইনের সৃষ্টি করেন। সংবিধানসম্মত না হলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের যে কোনো সিদ্ধান্ত ও কংগ্রেস প্রণীত আইনকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে। সেদেশে 'ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি' (Cheaks and Balance) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে সরকারের কোনো বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। বরং এর ফলে তিনটি বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ১৬ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ সরকারের এ তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করে দেয়া। এক বিভাগের কাজ অন্য বিভাগের কাজ থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। প্রতিটি বিভাগ পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হবে। প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে।

সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে সংগঠিত করা এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তাগণ ও তাঁদের মতামত

সরকারের ক্ষমতাকে তিনটি বিভাগের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয় প্রাচীনকাল থেকেই। তখনও এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারের বিশেষ কোনো বিভাগ, সংগঠন বা ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দেয়া। সে উদ্দেশ্য আজও অপরিবর্তিত রয়েছে। আধুনিক চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, সরকারের কোনো একটি বিভাগের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার প্রবণতা রোধ করে নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করাই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে (১) আলোচনামূলক (Deliberative), (২) শাসন সম্পর্কীয় (Magisterial), (৩) বিচার সংক্রান্ত (Judicial)- এ তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাষ্ট্রের তথা সরকারের ক্ষমতাকে উক্ত তিন ভাগে বিভক্ত করাই উত্তম। তাঁর মতে, "এই তিন ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হলে শাসন কাজের নিপুণতা হ্রাস পেতে পারে।"

মধ্যযুগে পাদুয়ার মার্সিলিও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, "শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের ক্ষমতা বিভক্ত হওয়া উচিত বা বাঞ্ছনীয়।"

প্রখ্যাত ফরাসি চিন্তাবিদ জ্যাঁ বোঁদার মতে, সরকার যে ধরনেরই হোক না কেন তার ক্ষমতা তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়, সব বিভাগকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত। ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই শুধু নয়, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রয়োজন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তাগণ ও তাঁদের মতামত

১৭৪৮ সালে ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু তাঁর "The Spirit of Laws" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা দান করেন। মন্টেস্কুর মতে, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে একচেটিয়া সরকারি ক্ষমতা প্রদান ঠিক নয়। তাঁর মতে, এক বিভাগের ক্ষমতা দিয়ে অন্য বিভাগের ক্ষমতা সংযত ও সীমিত করতে হবে। কোনো বিভাগ
তার নিজস্ব এখতিয়ারের বাইরে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চাইলে অন্য বিভাগ তা প্রতিরোধ করবে। মন্টেস্কু বলেন, "সরকারের তিন ধরনের ক্ষমতা অবশ্যই পৃথক হবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা এমনভাবে ব্যবহৃত হবে যেন একটি অপরটির সাথে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা করে।" (The three powers then must be separated, exercised by different individuals in such a way as to act as checks and balances against one another.) তাঁর মতে, "যখন আইন সংক্রান্ত ও শাসন সংক্রান্ত বিষয় একই লোকের বা একদল শাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তখন জনগণের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে যায়। অপরপক্ষে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা আইন পরিষদ বা শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র না হলে স্বাধীনতা বজায় থাকে না।" (When legislative and executive power are united in the same person or the governing body there can be no freedom; nor is there freedom where the power to adjudicate is not separated from the legislative and executive power.)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তাগণ ও তাঁদের মতামত

ইংল্যান্ডের আইন বিশারদ ব্লাকস্টোন বলেছেন যে, "যখনই আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকরী করার অধিকার একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত করা হয়, তখন সেখানে কোনো ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকে না।" (Whenever the right of making and enforcing the law is vested in the same man or the somebody of men, there can be no public liberty.)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বৈশিষ্ট্য: উপরের মতামত ব্যাখ্যা করলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়; যথা:

১. সরকারের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা তিনটি পৃথক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা উচিত।

২. প্রতিটি বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকবে। পৃথক ব্যক্তিবর্গ দ্বারা তিন বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ সম্পাদিত হবে।

৩. প্রতিটি বিভাগ তাদের নিজ এখতিয়ারে স্বাধীন ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে।

৪. এক বিভাগ অন্য বিভাগের ওপর অযথা হস্তক্ষেপ করবে না।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা

১. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়: সরকারের ক্ষমতাকে তিনটি বিভাগের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে ভাগ করে দেওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ সরকারের বিভাগগুলো জীবদেহের ন্যায় একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং সরকারের তিনটি বিভাগ পৃথক করলে পরস্পরের সহযোগিতা ও সমঝোতা নষ্ট হবে। প্রত্যেক বিভাগ নিজস্ব খেয়ালখুশি মতো কাজ করবে। এর ফলে শাসনব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে।

২. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অবাস্তব পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বাস্তবায়ন আজ পর্যন্ত কোনো দেশে সম্ভব হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয়েছে বলে দাবি করা হয়। কিন্তু বাস্তবে সেখানে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি কার্যকর হয়েছে। সেখানে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পরস্পর পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. এ নীতি গ্রহণযোগ্য নয়: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সরকারের তিনটি বিভাগকে তিন ভাগে ভাগ করার ফলে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ফলে সরকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "শাসনব্যবস্থায় তিনটি বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ পরস্পরের মধ্যে সংঘাত আনবে এবং সমঝোতা নষ্ট হবে। সরকারি কাজ পরিচালনায় সবাই দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে এবং শাসন কাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।"

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা

৪. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সঠিক নয়: এ নীতি সঠিক নয়। কারণ সরকারের তিনটি বিভাগকে একই পর্যায়ে ফেলা যায় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশি।

৫. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ভ্রান্ত: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি একটি ভ্রান্ত নীতি। কেননা শুধু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ করলেই স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্য নাগরিকের সদা সতর্কতা, সচেতনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

৬. পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ অবাস্তব: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী যদিও এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল, কার্যত এর পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, আইন পরিষদ সেখানে অনেক শাসন বিভাগীয় কাজ করে। প্রেসিডেন্টের মনোনয়নসমূহ সেখানকার সিনেট অনুমোদন করে। আইন পরিষদ অনেক সময়ই বিচার বিভাগীয় কাজ করে। যেমন, রাষ্ট্রপ্রধান আইনপরিষদ কর্তৃক অপসারিত হয়ে থাকেন। বিচার বিভাগ ন্যায়নীতির ভিত্তিতে অনেক সময় আইন প্রণয়ন করে একাধিক আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও বিচারকগণ নতুন নতুন আইনের সৃষ্টি করেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যদিও সরাসরিভাবে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করেন না, তবুও আইন পরিষদকে প্রভাবিত করে অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন রচনায় সমর্থ হয়েছেন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা

৭. স্বতন্ত্রীকরণ নীতি শাসন ব্যবস্থার মান অবনত করে: বিভিন্ন বিভাগকে স্বতন্ত্র এবং একে অপরের নিকট সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নিলে শাসনকার্যের মান অনেকাংশে অবনত হতে বাধ্য। উত্তম আইন প্রণীত না হলে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত বা কার্যকর হতে পারে না। অধ্যাপক ফাইনার তাই বলেছেন, "ক্ষমতাত্রয়কে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করলে সরকার কখনো মূর্ছা যাবে, কখনো কখনো ধনুষ্টংকার রোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়তে থাকবে, আবার কখনো অসাড় হয়ে পড়ে থাকবে।" সুতরাং এটি সুস্থ নীতি নয়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও ভারসাম্য নীতি

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল্যায়ন

Evaluation of the Theory of Separation of Powers

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু এরপরও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত নয়। শাসন কাজের সুবিধার জন্য আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যক্তি অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করতেই হবে। সুতরাং এ নীতির গুরুত্ব অসামান্য।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও ভারসাম্য নীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা মন্টেস্কুর 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির' দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। সেখানে আইন বিভাগের ক্ষমতা কংগ্রেসের ওপর, শাসন বিভাগের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের ওপর এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট ও অধঃস্তন আদালতের হাতে অর্পিত হয়েছে। কংগ্রেসের কোনো সদস্য মন্ত্রিসভার সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারেন না।

প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রিসভার সদস্য বা শাসন বিভাগীয় কোনো কর্মকর্তা কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন না। প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের সম্মতি নিয়ে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের নিযুক্ত করেন। বিচারকগণ শাসন ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বিদেশে কূটনৈতিক মিশনে দূত প্রেরণ, শান্তি চুক্তি ও সন্ধি এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিনেটের সম্মতি প্রয়োজন। অপরপক্ষে কংগ্রেসের বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য প্রেসিডেন্টের সম্মতি অপরিহার্য। সংবিধানসম্মত না হলে প্রেসিডেন্টের যে কোনো সিদ্ধান্ত ও কংগ্রেস প্রণীত আইনকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও ভারসাম্য নীতি

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রেই পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বাস্তবে কার্যকর হয়নি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যে নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে তা হলো ক্ষমতার 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' (Checks & Balance theory)। কেননা সে দেশে রাষ্ট্রপতি (শাসন বিভাগ), কংগ্রেস (আইন বিভাগ) ও সুপ্রিম কোর্ট (বিচার বিভাগ) একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে বরং ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সেদেশের সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্যও ছিল সরকারের এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা। এভাবে তাঁরা সরকারের বিভাগগুলোর স্বেচ্ছাচারী হবার প্রবণতারোধ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ১৭ সরকারের অঙ্গসমূহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

সরকারের অঙ্গসমূহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সরকারের অঙ্গসমূহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

সরকারের কাজ তিন প্রকার, যথা- আইন প্রণয়ন, শাসন কাজ পরিচালনা এবং বিচার কাজ সম্পাদন। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ সে আইন প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের সাথে সরকারের অন্য দুটি বিভাগের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বিচার বিভাগের কাজ হচ্ছে আইন প্রয়োগ এবং আইনের ব্যাখ্যা দান করা। বিচারকগণ যদি আইনসভা প্রণীত কিংবা প্রথাগত আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট বা পরস্পর বিরোধী বলে মনে করে তাহলে এর ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। আইনের এই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে নজির বা আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিচারকগণ কোনো মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে যদি মনে করেন যে, মামলাটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণীত হয়নি, তাহলে তাঁরা নিজেদের ন্যায়বোধ ও সুবিবেচনা প্রয়োগ করে আইনটির ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা নতুন আইন তৈরি করে মামলাটির বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন। বিচারক প্রণীত এরূপ আইন বা আইনের ব্যাখ্যাকে পরবর্তীতে নজির হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের আইনকে 'বিচারক প্রণীত আইন' বলা হয়। পৃথিবীতে যেসব রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেখানে বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে কেন্দ্র ও অঙ্গরাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখে।

সরকারের অঙ্গসমূহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক হিসেবেও বিচার বিভাগ দায়িত্ব পালন করে। আইনের জটিল প্রশ্ন নিরসন কিংবা সংবিধান সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নেও শাসন বিভাগ কিংবা আইন বিভাগ সর্বোচ্চ আদালতের নিকট সঠিক পরামর্শ চাইতে পারে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ সঠিক পরামর্শ প্রদান করে আইনগত ও সাংবিধানিক জটিলতা নিরসনে সাহায্য করে থাকে।

সরকারের তিনটি বিভাগের কাজকে ভাগ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল এরিস্টটলের সময় থেকেই। এরপর ফরাসি চিন্তাবিদ জ্যাঁ বোঁদা ও মন্টেস্কু এই তিনটি বিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের জন্য আরো জোরালো বক্তব্য রাখেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা মন্টেস্কুর 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি' দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। সেদেশের সংবিধান অনুযায়ী আইন বিভাগের ক্ষমতা কংগ্রেসের ওপর, শাসন পরিচালনা ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের ওপর এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। সে দেশের বিচারকগণ শাসন ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

সরকারের অঙ্গসমূহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

কিন্তু বাস্তবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবে কার্যকর হয়নি। সেদেশে কার্যকর হয়েছে ক্ষমতার 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' (Checks & Balance theory)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্ট একে অপরকে সহযোগিতা ও নিয়ন্ত্রণ করছে। বিদেশে কূটনৈতিক মিশনে দূত প্রেরণ, শান্তি চুক্তি ও সন্ধি এবং উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেটের সম্মতি প্রয়োজন। অপরপক্ষে কংগ্রেসের কোনো বিলকে আইনে (Act) পরিণত করার জন্য প্রেসিডেন্টের সম্মতি অপরিহার্য। আবার সংবিধানসম্মত না হলে প্রেসিডেন্টের যে কোনো সিদ্ধান্ত ও কংগ্রেস প্রণীত আইনকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে।

প্রকৃত অর্থে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতাগণের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা। এর দ্বারা তারা সরকারের বিভাগগুলোর স্বেচ্ছাচারী হবার প্রবণতা রোধ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতো পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই একদিকে যেমন সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতাকে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করা হয়েছে, তেমনি তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নীতিকেও ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে সরকারের কোনো বিভাগের পক্ষে যেমন স্বেচ্ছাচারী হবার প্রবণতা রোধ হয়েছে তেমনি তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির পথও প্রশস্ত হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ১৮ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি?[রা. বো. ২০২২]

ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬

২। সরকারের বিভাগ কোন্টি?

ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ গ. বিচার বিভাগ ঘ. ক, খ ও গ

৩।"সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র"-বক্তব্যটি কার?[চ. বো. ২০২১]

ক. অধ্যাপক গার্নার খ. অধ্যাপক গেটেল গ. অধ্যাপক ম্যাকাইভার ঘ. অধ্যাপক লাস্কি

৪। সরকারের অঙ্গ বা বিভাগ কয়টি?[ঢা. বো. ২০২১; কু. বো. ২০১৬, ২০১৫; য. বো. ২০১৯; ব. বো. ২০১৭, ২০১৫; ম. বো. ২০২১;]

ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৫।কোন্টি সরকারের অঙ্গ বা বিভাগ নয়?[রা. বো. ২০২২]

ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ গ. বিচার বিভাগ ঘ. নির্বাচকমণ্ডলী

৬ ।কয়টি নীতির ভিত্তিতে এরিস্টটল সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন?[ব. বো. ২০২২, ২০২১; চ. বো. ২০১৭]

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৭।কোন্ ভিত্তি বা মাপকাঠি অনুযায়ী এরিস্টটল সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন?[চ., ব., বো. ২০১৫]

ক. সংখ্যানীতি খ. উদ্দেশ্যনীতি গ. সংখ্যা ও উদ্দেশ্যনীতি ঘ. ন্যায়নীতি

৮।কে আধুনিক সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন?[য. বো. ২০২১]

ক. লক খ. লিকক গ. লাস্কি ঘ. রেনান

৯।এরিস্টটলের মতে বিকৃত সরকার কোন্টি?[রা. বো. ২০২২]

ক. পলিটি খ. রাজতন্ত্র গ. গণতন্ত্র ঘ. অভিজাততন্ত্র

১০।এরিস্টটলের মতে সর্বোত্তম সরকার কোন্টি? অথবা, এরিস্টটল কোন্ ধরনের সরকারকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন?[য. বো. ২০২১; ম. বো. ২০২১; চ. বো. ২০১৯, ২০১৫; দি. বো. ২০২২]

ক. রাজতন্ত্র খ. অভিজাততন্ত্র গ. পলিটি ঘ. গণতন্ত্র

১১। রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতালাভের পদ্ধতি অনুসারে সরকার হয় দুই ধরনের; যথা-

ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র খ. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

গ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত ঘ. এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১২। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান অনুসারে সরকার হয় দুই রকম; যথা-

ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র খ. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

গ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত ঘ. এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

১৩। আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারকে যে দুই ভাগে ভাগ করা হয় তা হলো-

ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র খ. এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্র

গ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত ঘ. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

১৪। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের নীতিতে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, এগুলো হলো-

ক. এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্র খ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত

গ. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র ঘ. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

১৫। ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সরকার কাঠামো

টপিক – ১৯ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. নাঈম এর দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ। অপরদিকে মি. জনের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নয়। তবে তার দেশ জাতীয় সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

[ঢা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. এককেন্দ্রিক সরকার কী?

খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. নাঈম এর দেশের সরকারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. নাঈম এর সরকারব্যবস্থার সাথে মি. জনের সরকার ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'A' রাষ্ট্রে সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন করে দেয়া আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ক্ষমতার চর্চা করে। 'B' রাষ্ট্রে একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়। [কু. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. 'Lag' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

খ. নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকের A রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? তার গুণসমূহ উল্লেখ করো।

ঘ. A এবং B রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

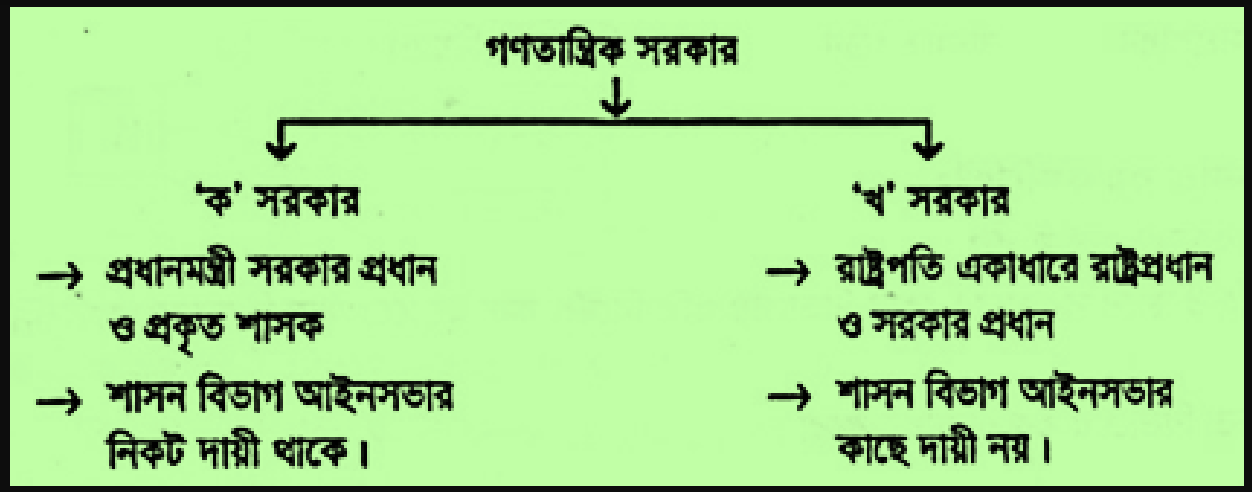

প্রশ্ন:

ক. সাম্য কী?

খ.বিচারবিভাগের স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' সরকার ব্যবস্থার সাথে তোমার পঠিত কোন সরকারব্যবস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনটিকে তুমি অধিকতর জনকল্যাণকর বলে মনে করো? যুক্তি দাও।

THANK YOU